পারিবারিক সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার নিয়ে ‘নারী অঙ্গন’-এর বিশেষ সংখ্যা

হিস্যা

নারী অঙ্গন

পারিবারিক সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার নিয়ে 'নারী অঙ্গন'-এর বিশেষ সংখ্যা

হিস্যা

সম্পাদক

নাদিরা ইয়াসমিন

সম্পাদনা সহযোগী

সাবিকুন্নাহার প্রীতি
সাবিনা শিকদার
নাহিদা আঁখি
রাবেয়া মুহিব
সুমাইয়া শিকদার

নারী অঙ্গন

ভোর হচ্ছে।
ভোরের কুয়াশায় ঘাস স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো
বিন্দু বিন্দু রোদকণা আঁকড়ে ধরেছে
যেন জলপায়ে হাঁটছে সুলতানা
জমিনে পড়ছে পায়ের দাগ
মানুষের পায়ের মতোই
পুরুষের পায়ের মতোই
অথচ এই জমিনে নাই তার সমান ভাগ।
সাদা বরফের মতো শীতল
খতিয়ান জমে আছে একখণ্ড
আর সেইসব খতিয়ান হতে ক্রমশ মুছে যাচ্ছে
সুলতানাদের পায়ের দাগ।

এই ভোর চেয়েছিলে বুঝি?
মাঠ হতে মাঠ
খুঁজি
কীর্তি সমান
অথচ
অর্ধেক রুজি।

মানুষের প্রয়োজনে
স্বৈরাচারের পতনে
ছিলে পাশে
একাত্তর
ঊনসত্তর
কিংবা নব্বই।
চব্বিশের গ্রাফিতি হতে
সুবোধ ফিরে আসুক
জমিনে জমিনে বোনা হোক স্বপ্নের মতো দিন।

— **মমিন আফ্রাদ**

হিস্যা

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নামলিপি
হিমেল কর্মকার

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
রাসেল ওয়ালিদ

মুদ্রণ
ছাপাঘর

প্রাপ্তিস্থান
নারী অঙ্গন
আবদুল হালিম সুপার মার্কেট
কলেজ রোড, পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী, নরসিংদী

যোগাযোগ
nariongan@gmail.com
০১৬২০ ৪৪৭৮৭৬

শুভেচ্ছা মূল্য
১০০ টাকা

'নারী অঙ্গন' কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
nariongan
nariongan.com

’২৪-এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে
নরসিংদীসহ সারা দেশের শহীদ, আহত ও অংশগ্রহণকারী
নারী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে——

স ম্পা দ কী য়

হযরত ঈসা (আ.) একদা বলেছিলেন, "তুমি অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পেতে ইচ্ছা করো, অপরের সাথে সেরূপ ব্যবহার করিও।"

নাগরিক হিসাবে যদি ব্যক্তি-সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার পেতে চাই, তাহলে রাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক নাগরিক নারীদের পারিবারিক সম্পত্তিতে সম-অধিকারের দাবিকেও আমাদের মেনে নিতে পারতে হবে। তা না হলে নিজেদের জন্যও সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির নৈতিক যোগ্যতা হারাবো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীর মানবাধিকারকে অস্বীকার ও লঙ্ঘন করা হয়েছে। পারিবারিক সম্পত্তিতে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নারীর মানবাধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া এবং প্রতিষ্ঠারও দাবি। একই সাথে নারীর 'সিভিল পার্সন' হয়ে ওঠা এবং স্বীকৃতিরও দাবি।

'২৪-এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শ্লোগানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি শ্লোগান ছিল, "লাখো শহিদের রক্তে কেনা দেশটা কারও বাপের না"। আমরাও স্বপ্ন দেখি এই দেশটা একদিন সকল নাগরিকের হবে। হবে নারী ও পুরুষ সকলের। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নরসিংদী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশেই 'নারী অঙ্গন'-এর বন্ধুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। গণ-অভ্যুত্থানে জুলাই কন্যাদের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি এক বৈষম্যহীন বাংলাদেশের বার্তা দিয়েছিল। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, জুলাই কন্যারা নারী কোটা চায়নি। চেয়েছে বৈষম্যের অবসান। নারীদের জন্মগতভাবে পাওয়া অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত করে লোক দেখানো জেন্ডার বাজেট, বাসে-সংসদে সংরক্ষিত আসন ইত্যাদি দিয়ে পারিবারিক সম্পত্তিতে সম-অংশীদারত্বের মতো অনন্তকাল বৈষম্য জিইয়ে রাখার কাঠামোগত জায়গা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখা হয়েছে এতদিন। বাংলাদেশের মোট জমির মালিকানার ৯৬ শতাংশই পুরুষের দখলে। কেন এই বৈষম্য? নতুন সংবিধানে কেবল নারীর সম-অধিকারের চটকদার কথা রাখলেই চলবে না, সম-অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আলাদা কমিশন গঠনের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

২০২১ সালের ২১ জুন পরীক্ষামূলকভাবে এবং ২০২২ সালের ৮ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে 'নারী অঙ্গন'-এর যাত্রা শুরু হয়। যাত্রালগ্ন থেকেই আমরা নারীদের

দক্ষতা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক-শিক্ষাগত অগ্রগতি ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি এবং উদ্যোগ নিয়ে আসছি। সেজন্য পাক্ষিক পাঠ-আড্ডা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, সাইক্লিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা, স্বল্প পরিসরে নারী বন্ধুদের আইনগত সুবিধা প্রদান, ওয়েব পোর্টাল প্রকাশ ইত্যাদি করেছি। পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার আদায়ের জন্য জনমত গঠন এবং সরকারের কাছে নারীর এই সাংবিধানিক অধিকারের দাবি পৌঁছে দিতেও 'নারী অঙ্গন' কাজ করে আসছে। সেই কাজেরই ধারাবাহিকতায় আমাদের পত্রিকা প্রকাশের এই উদ্যোগ।

নরসিংদীসহ সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা 'নারী অঙ্গন'-এর বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমালোচকরা আমাদের কাজের প্রেরণা। লেখা দিয়ে, আর্থিক সহযোগিতা করে, সবকিছুতে সাথে থেকে তারাই মূলত 'নারী অঙ্গন'-এর সব কাজ বিশেষ করে এই পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যের আসল কারিগর। তাদের সবার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই 'বাংলাদেশ হিন্দু আইন সংস্কার পরিষদ' এবং বিভিন্ন নারী সংগঠনের বন্ধুদের– তারা লেখা দিয়ে, বিভিন্ন সময় পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে এবং সংকটে আমাদের পাশে থেকেছেন। ধন্যবাদ জানাতে চাই নরসিংদী সরকারি কলেজে কর্মরত শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের। যখনই চেয়েছি তারা আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যারা '২৪-এর এপ্রিলে 'পারিবারিক সম্পত্তিতে সম-অধিকার এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা' শিরোনামের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা অনুষ্ঠানটিকে পণ্ড করে দিয়েছিলেন, তাদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই। তারা বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন আমাদের, যা এই পত্রিকার বিভিন্ন লেখায় উঠে এসেছে।

যেকোন সমালোচনা ও দ্বিমতকে 'নারী অঙ্গন' ইতিবাচক জায়গা থেকে দেখে। পত্রিকার লেখা নিয়ে আপনাদের সমালোচনা এবং দ্বিমতকেও স্বাগত জানানো হবে আন্তরিকতার সাথে।

নাদিরা ইয়াসমিন
২৫ জানুয়ারি ২০২৫

সূচি

বাংলাদেশের উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থান | ১৩
মোছাঃ মর্জিনা খাতুন

নারী-পুরুষ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে প্রয়োজন
পারিবারিক সম্পত্তিতে সম-অংশীদারত্বের আইন প্রণয়ন | ২১
অদিতি জামান

সম্পত্তিতে অধিকার এবং নারীর স্বাধীন অস্তিত্ব | ২৮
মনিরুল ইসলাম

পুংকেশরের রাজনীতি: সম্পত্তিতে নারীর অধিকারহীনতা | ৩৩
নাদিয়া ইসলাম

সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকার:
নারীকে রাজনৈতিক জীব হিসাবে স্বীকৃতির প্রাথমিক পদক্ষেপ | ৪১
পারভেজ আলম

সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি | ৫০
শম্পা বসু

হিন্দু নারী এক ঠিকানাবিহীন ভাসমান মানবসত্তা | ৫৪
ভানুলাল দাস

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় চাই উত্তরাধিকারে সম-অধিকার | ৫৬
সীমা মোসলেম

মুসলিম আইন পরিবর্তনের গতিধারা | ৬০
পুলক ঘটক

সম্পত্তিতে সমানাধিকার:
ন্যায্যতা ও মানবিক মর্যাদার প্রথম শর্ত | ৬৪
রেক্সোনা সুমি

নারী-পুরুষ বৈষম্যের উৎস সন্ধান
মমিন আফ্রাদ | ৬৮

সমতার সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দ্বিচারী চরিত্র
নোরা আহমেদ | ৭২

নারীর মর্যাদা, সম্পত্তি বণ্টন এবং
আরব ঐতিহ্য থেকে বৈশ্বিক মূল্যবোধ বিবেচনা
মোকাররম হোসেন | ৮২

বৈষম্য দূর করতে উত্তরাধিকারে নারীর সমান অধিকার চাই
শাহনাজ সুমি | ৮৫

সম্পত্তি সম-বণ্টনে ধর্মের অজুহাত এবং প্রকৃত বাস্তবতা
মীর হুযাইফা আল মামদূহ | ৮৮

হিন্দু নারীর আলোর পথ: পরিবর্তন ও মুক্তির যাত্রা
ঝুমুর বিশ্বাস | ৯২

উত্তরাধিকার আইন:
নারীকে সেলফহীন করে রাখার সবচেয়ে কার্যকর পিতৃতান্ত্রিক হাতিয়ার
মুরাদ হাসান | ৯৬

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এবং একটি পর্যালোচনা
আজহারুল হক লিংকন | ৯৯

পুরুষতান্ত্রিকতার ভিত্তি ও নারী
শান্তনু বোস | ১০২

সম্পত্তি বণ্টনে অসাম্য: কোন বিকল্পই কি নেই
অরিত্র আহমেদ | ১০৮

গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে
উত্তরাধিকার আইন সংস্কার প্রশ্নে
রাবেয়া মুহিব | ১১৮

স্যোশাল মিডিয়া খণ্ডচিত্রে এপ্রিল ’২৪ | ১২১

নারী

বাংলাদেশের উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থান

মোছাঃ মর্জিনা খাতুন

পারিবারিক বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা থেকে যে আইন তা-ই পারিবারিক আইন নামে পরিচিত। পারিবারিক বিষয়াদি, যেমনঃ বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব নির্ধারণ ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি এই আইনের অন্তর্ভুক্ত। আইন মূলত একটি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। আমাদের দেশের এই পারিবারিক আইন বৈষম্যমূলক। অন্যান্য দেওয়ানী-ফৌজদারী আইন নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক না হলেও এই পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনে বৈষম্য রয়েছে। কারণ আমরা যে রাষ্ট্রে বাস করছি তা একটি বৈষম্যমূলক রাষ্ট্র। এখানে নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, ধর্মে-গোত্রে বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্যের কারণে যে বৈষম্যমূলক আইনের সৃষ্টি তার মূল উৎপাটনে কাজ করাই আমাদের লক্ষ্য।

বাংলাদেশের নারী সমাজকে প্রধানত দুটি বিষয়কে সামনে রেখে লড়াই করতে হচ্ছে–

১. পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং
২. পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তি।

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা হল সেই পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে নারীকে প্রতিনিয়ত হেয় প্রতিপন্ন করে দেখা হয়। বিদ্যমান এই সমাজ প্রথা, রীতি-নীতি, আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে এই মানসিকতাকে টিকিয়ে রেখেছে। আর উৎপাদনের হাল-হাতিয়ার মালিক তার অধীনে রেখে পুঁজির শোষণকে টিকিয়ে রাখছে। ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এই শোষণের শিকার হলেও সমাজে নারীর অধস্তনতার কারণে নারীই বেশি শোষণের শিকার। তাই বাংলাদেশের নারীসমাজ সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এমন অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রতিষ্ঠার দাবি করে আসছে। ইউনিফর্ম সিভিল কোড হল সেই আইন যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে নাগরিক হিসাবে একই অধিকার ভোগ করবে। নারী বা পুরুষ ভেদে বা ধর্ম ভেদে আলাদা কোন আইন থাকবে না। সবাই নাগরিক হিসাবে যার যে অধিকার সেটা ভোগ করবে।

আমরা সকলেই জানি, বাংলাদেশের এই পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন ধর্মীয় বিধান থেকে এসেছে। যদিও বিভিন্ন সময়ে এর পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধন হয়েছে। যেমন, ১৯৬১ সালের পূর্বে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের সন্তান মারা গেলে এতিম নাতি-নাতনিরা পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ ও মাতামহীর সম্পত্তিতে অংশীদার হতো না। কিন্তু ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে সম্পত্তিতে এতিম সন্তানদের অংশীদারত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহ আইন ১৮৫৬ সালে পাশ করা হয়। খ্রিস্টান ধর্মের আইনেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও উপেক্ষিত।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু এই সনদ স্বাক্ষর করার ৪০ বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত সিডও সনদের পূর্ণ স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন হয়নি। সিডও সনদের প্রাণ বলে খ্যাত দুটি ধারায় সরকার আজও স্বাক্ষর করেনি। যেহেতু পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন ধর্মভিত্তিক, সেজন্য নারীসমাজের পক্ষ থেকে সম্পত্তিসহ সকল ক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উঠলেও সরকার সেই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছে বারবার। প্রতিটি সরকার যেহেতু ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করে, সেজন্য বৈষম্যমূলক এই আইন পরিবর্তনে তারা কোন ভূমিকা পালন করে না। অথচ সংবিধানের ২৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।" কিন্তু পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বিদ্যমান এই উত্তরাধিকার আইন কীভাবে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা তা উত্তরাধিকার আইন পর্যালোচনা করলেই পাওয়া যাবে।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তার জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের যে অধিকার জন্মায় তাকে উত্তরাধিকার বলে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের মূল উৎস কোরান হলেও বিভিন্ন সময়ে মুসলিম আইন বিশারদগণ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তরাধিকার নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের ৩ টি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. জীবিত অবস্থায় যেকোন ব্যক্তির সম্পত্তিতে অন্য কারোর অধিকার জন্মায় না।

২. যেকোন মুসলমান ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় তার সম্পত্তি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে।

৩. কোন মুসলমান জীবিত অবস্থাতেই তার সম্পত্তি হস্তান্তর সম্বন্ধে নির্দেশ রেখে যেতে পারে যা তার মৃত্যুর পর কার্যকরী হয়। একে উইল বা অছিয়তনামা বলে।

উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বশর্ত

একজন মুসলিম নারী বা পুরুষের মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টনের আগে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পালন করতে হবে–

১. মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের খরচ পরিশোধ করা,

২. স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ করা,

৩. মৃত ব্যক্তির কোন ঋণ বা দেনা থাকলে তা পরিশোধ করা,

৪. মৃত ব্যক্তি কর্তৃক কোন উইল করা থাকলে সেই উইলে উল্লেখিত সম্পত্তি প্রদান করা। এরপর যে সম্পত্তি থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হবে।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তির উত্তরাধিকার

মুসলিম আইনের বিধান মতে উত্তরাধিকারীদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা:

১. অংশীদার,

২. অবশিষ্টভোগী,

৩. দূরবর্তী আত্মীয়।

অংশীদারদের সম্পত্তি দেওয়ার কিছু কিছু ব্যতিক্রম সাপেক্ষে অবশিষ্টভোগীরা সম্পত্তিতে অংশীদার হোন। আর মৃত ব্যক্তির অংশীদার ও অবশিষ্টভোগী অংশীদার না থাকলে দূরবর্তী আত্মীয়গণ সম্পত্তি পান।

অংশীদার মোট বারোজন। তার মধ্যে আটজনই নারী। এর মধ্যে পাঁচজন প্রধান অংশীদার। এই পাঁচজন অংশীদার হলো:

ক. পিতা, খ. মাতা, গ. স্ত্রী/স্বামী, ঘ. ছেলে এবং ঙ. মেয়ে। প্রধানত এই পাঁচজন উত্তরাধিকারীর মাঝে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন হয়ে থাকে। এই পাঁচজন উত্তরাধিকারী বেঁচে থাকলে বাকিরা সম্পত্তি পায় না।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীর সম্পত্তি

কন্যা হিসাবে–

মৃত ব্যক্তির যদি একটিমাত্র কন্যা থাকে এবং কোন পুত্র না থাকে তাহলে কন্যা পিতার মোট সম্পত্তির অর্ধেক বা ১/২ অংশ পাবে।

মৃত ব্যক্তির যদি কোন পুত্র সন্তান না থাকে এবং দুই বা ততোধিক কন্যা থাকে তবে তারা সম্মিলিতভাবে মোট সম্পত্তির ২/৩ পাবে।

মৃত ব্যক্তির কন্যার সাথে পুত্র থাকলে প্রত্যেক পুত্র কন্যার দ্বিগুন সম্পত্তি পাবে।

স্ত্রী হিসাবে–

স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে দুইভাবে অংশ পান। প্রথমত যদি তাদের কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান না থাকে তাহলে স্ত্রী স্বামীর মোট সম্পত্তির ১/৪ অংশ পাবেন। দ্বিতীয়ত সন্তান থাকলে স্ত্রী মোট সম্পত্তির ১/৮ অংশ পাবেন। আবার যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকে তাহলে তারা ১/৪ অথবা ১/৮ অংশ নিজেদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে নেবেন।

স্বামীও স্ত্রীর সম্পত্তিতে দুইভাবে অংশ পান–

প্রথমত যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে তবে স্বামী স্ত্রীর মোট সম্পত্তির ১/২ অংশ পাবেন।

দ্বিতীয়ত যদি স্ত্রীর সন্তান থাকে তা ওই স্বামীরই হোক বা অন্য স্বামীর বা তাদেরই সন্তান থাকে, তবে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির ১/৪ অংশ পাবে।

মা হিসাবে–
মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান থাকলে মা মোট সম্পত্তির ১/৬ অংশ পাবে।
যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান না থাকে, একজনের বেশি ভাই বা বোন না থাকে তাহলে মা মোট সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবেন।

বোন হিসাবে–
মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী কেউ না থাকলে এবং শুধু একজন বোন থাকলে বোন অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।
মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, পিতা, দাদা বেঁচে থাকলে বোন কোন সম্পত্তি পাবে না।

উত্তরাধিকার আইন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কন্যা, স্ত্রী, মাতা ও বোন কেউই পিতা, স্বামী, ভাইয়ের সমান সম্পত্তি পায় না। আইনগতভাবে মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক সম্পত্তি পায়। আইনগত এই অধিকার থেকেও মেয়েদের বঞ্চিত করা হয়। আবার সমাজে এমন ধারণা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যে, যে সকল মেয়েরা সম্পত্তির অংশ নেয় তারা সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে নিচু স্তরের। মিথ্যা এই আভিজাত্যের কারণে বোনের সম্পত্তি সাধারণত ভাইদের ভোগ দখলে চলে যায়। মাতাও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তার সম্পত্তি ভাগের প্রশ্ন তোলেন না। এই কথাও প্রচলিত আছে যে, মেয়েরা বাবার কাছ থেকে সম্পত্তি পান আবার স্বামীর কাছ থেকেও সম্পত্তি পান। ফলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি সম্পত্তি পান। কিন্তু উল্লিখিত আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে, কোন অবস্থায়ই মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি সম্পত্তি পান না।

সর্বক্ষেত্রে নারীর সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যখন পৃথিবীব্যাপী তোলপাড়, তখন আমরা আজও সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই করছি। বর্তমান সরকার ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়ন নীতিমালায় সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে বলেছিল, "উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ ও ভূমির উপর অধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ দেওয়া হবে।" অথচ ২০১১ সালের নারী উন্নয়ন নীতিমালায় উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ ও ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানের কথা বলা হল। কোথায় সমান অধিকার আর কোথায় অর্জিত সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। একই সরকার দুই আমলে দুই ধরনের বক্তব্য প্রদান করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে নারীর সম-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে। নারী যখন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তখন উত্তরাধিকার আইনের এই বৈষম্য বিলোপ না করা নারীর প্রতি রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বিলোপ করে সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই হবে নারীর প্রতি রাষ্ট্রের যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

এতিম নাতি-নাতনিদের সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকার

১৯৬১ সালের পূর্বে প্রচলিত আইন অনুসারে এতিম নাতি-নাতনিরা তাদের নানা, নানি, দাদা বা দাদির নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পত্তি পেতো না। 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ' ১৯৬১ সালের ১৫ জুলাই তারিখে বলবৎ হয়েছে এবং এখনও এই আইন বাংলাদেশে

বলবৎ রয়েছে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৪ নম্বর ধারার মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, যার সম্পত্তি বণ্টন হবে তার মৃত্যুর পূর্বে তার কোন পুত্র বা কন্যা মারা গিয়ে থাকলে এবং মৃত পুত্র/কন্যার সন্তান জীবিত থাকলে সম্পত্তি বণ্টনের সময় তার সম্পত্তির ঐ অংশ পাবে যা তাদের পিতা কিংবা মাতা বেঁচে থাকলে পেতো। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির এতিম নাতি-নাতনি থাকলে সম্পত্তি বণ্টনের সময় তাদের বাবা-মাকে জীবিত মনে করে সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পূর্বে মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ তাদের পিতা-মাতার স্থলাভিষিক্ত হবে। কিন্তু তাদের স্বামী বা স্ত্রী কিছুই পাবে না।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর সম্পত্তি

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার আইন দায়ভাগা আইন মতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এখানে আমরা উত্তরাধিকার আইনে হিন্দু নারীদের অবস্থান দেখবো।

দায়ভাগা আইন মতে উত্তরাধিকারীদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. সপিণ্ড: (মোট ৫৩ জন) এরা প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারী,

২. সকুল্য: (মোট ৩৩ জন) এরা দ্বিতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকারী এবং

৩. সমানোদক: (মোট ১৪৭ জন) এরা তৃতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকারী।

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির মোট উত্তরাধিকারীর সংখ্যা ৫৩ + ৩৩ + ১৪৭ = ২৩৩ জন।

উক্ত তিন শ্রেণির মধ্যে সপিণ্ডরা কেউ থাকলে সকুল্যরা সম্পত্তি পাবে না, আবার সকুল্যরা থাকলে সমানোদকরা সম্পত্তি পাবে না। এক্ষেত্রে সপিণ্ডদের সংখ্যা ৫৩ জন। ফলে সকুল্য ও সমানোদকদের সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই সপিণ্ডদের আলোচনাই এখানে প্রধান বিবেচ্য। সপিণ্ড ৫৩ জনের মধ্যে নারী মাত্র পাঁচজন। এরা হলেন: বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী। 'সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন-১৯৩৭' পাশ হওয়ার পর বিধবা এক বা একাধিক হলে সকলে মিলে এক পুত্রের সমান সম্পত্তি জীবনস্বত্বে ভোগ-দখল করতে পারবেন। স্ত্রীর পরেই কন্যার দাবি। কন্যাদের মধ্যে প্রথমে অবিবাহিত কন্যা, এরপর ছেলে সন্তান আছে এমন কন্যারাই জীবনস্বত্বে সম্পত্তি লাভ করবেন। সে সকল কন্যাদের সম্পত্তি নেই, যে সকল বিধবা কন্যাদের পুত্র সন্তান নেই। অর্থাৎ যে কন্যাদের শুধুমাত্র কন্যা সন্তান, তারা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। এই আলোচনায় দেখা যায় হিন্দু নারীরা উত্তরাধিকার সূত্রে কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্পত্তি পেলেও তা শুধু ভোগ করতে পারবেন। কিন্তু বিক্রি, উইল, দান, স্বাধীনভাবে হস্তান্তর ইত্যাদি করতে পারেন না। শুধুমাত্র তিনি যার কাছ থেকে সম্পত্তি পেয়েছেন তার শ্রাদ্ধ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন।

স্ত্রীধন

স্ত্রীধন হল যে সম্পত্তিতে একজন নারীর পূর্ণ মালিকানা বা অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ যেসব সম্পত্তি নারীরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিক্রি, উইল, মালিকানা পরিবর্তন এবং ভোগ-দখল করতে পারে। এক কথায় যেসব সম্পত্তিতে নারীরা সম্পূর্ণ স্বত্বের অধিকারী হয়, সেই সব সম্পত্তিকেই স্ত্রীধন বলা হয়। স্ত্রীধন আলোচনার ক্ষেত্রে স্ত্রী বলতে কারও বিবাহিত মেয়ে বা যে কোন নারীকে বোঝানো হয়েছে।

স্ত্রীধন মালিকানা প্রাপ্তির উপায়সমূহ

একজন নারী যে সমস্ত উপায়ে স্ত্রীধনের মালিকানা প্রাপ্ত হয় তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. একজন নারী কুমারী, বিবাহিত অথবা বিধবা অবস্থায় উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতিত অন্য যেকোনভাবে সম্পত্তির মালিক হলে সেই সব সম্পত্তিই স্ত্রীধন।

২. স্বামী-স্ত্রী পৃথক বসবাস থাকা অবস্থায় স্বামীর নিকট থেকে ভরণপোষণের জন্য প্রাপ্ত মাসোহারা দ্বারা অর্জিত সম্পত্তিও স্ত্রীধন হিসাবে গণ্য হবে।

৩. স্ত্রীধন দ্বারা অর্জিত সম্পত্তিও স্ত্রীধন।

উল্লিখিত উপায়ে প্রাপ্ত সম্পত্তি একজন নারী ইচ্ছানুযায়ী ভোগ, দখল, বিক্রি, উইল, দান ইত্যাদি করতে পারবেন। এছাড়া কোন নারী নিজে উর্পাজন করে সম্পত্তি অর্জন করলে তা-ও স্ত্রীধন হিসাবে গণ্য হবে।

হিন্দু আইনের সংস্কার

স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও এদেশে নারীর সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে এ কথা চরম-পরম সত্য। উল্লিখিত উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। নারীর সম্পত্তিতে অংশীদারত্ব থাকলে তা শুধু ভোগ-দখলের জন্য। কারণ পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্জা, এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করাই হিন্দু আইনের মূল লক্ষ্য। অথচ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের হিন্দু পারিবারিক আইনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন: হিন্দু বিবাহ আইন-১৯৫৫, নাবালকের সম্পত্তি বিষয়ক আইন-১৯৫৬, হিন্দু দত্তক গ্রহণ ও ভরণপোষণ আইন-১৯৫৬, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন-১৯৫৬। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইনে এখনও সেই রক্ষণশীল প্রাচীন ধ্যান-ধারণাই রয়ে গেছে। হিন্দু পারিবারিক আইন পুরোপুরি নারী অধিকারের পরিপন্থী। তাই হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার এখন সময়ের দাবি।

খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনে নারী

বাংলাদেশের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উত্তরাধিকার নির্ধারণ হয় ১৯২৫ সালের সাকসেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী। কোন খ্রিস্টান নাগরিকের মৃত্যু হলে তার সম্পত্তি সাকসেশন অ্যাক্টের ২৭ ধারায় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী ভাগ করা হয়। এই নিয়মগুলি উত্তরাধিকার নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য। নিয়মগুলো হলো:

১. উত্তরাধিকার হিসাবে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার,

২. পূর্ণ রক্তসম্পর্ক ও অর্ধ রক্তসম্পর্কের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই,

৩. নিকটবর্তী আত্মীয় দূরবর্তী আত্মীয়কে প্রতিস্থাপিত করে এবং

৪. মাতৃগর্ভের সন্তানও উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য হবে।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর পারিবারিক আইন

বাংলাদেশে মোট ১৫ টির মতো ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। চাকমা, মগ, খুমী– এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। সাঁওতাল, রাজবংশী, খাসিয়া, গারো, হাজং, সিন্ধা, হাদি, পলিয়া, মণিপুরী, ত্রিপুরা– এরা মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। পরে এদের কেউ কেউ খ্রিস্টান ধর্মও গ্রহণ করেছে। এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ধরা-বাঁধা পারিবারিক আইন নেই। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথা ও সংস্কৃতির

উপর ভিত্তি করেই তাদের পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজন লিখিত পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন।

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের এই যুগে এসে আমাদেরকে নারী-পুরুষের সমতা তথা উত্তরাধিকার আইনে সমতার দাবি উত্থাপন করতে হচ্ছে। কারণ উল্লিখিত আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে, ধর্মভিত্তিক উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নেই। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তিতে নারীর অংশ বৈষম্যমূলক। কোন বাবার যদি এক বা একাধিক কন্যা সন্তান থাকে তাহলে আইন অনুসারে বাবা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ কন্যা সন্তানকে দিতে পারবে না। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থান সবচেয়ে অবহেলিত। এখানে নারীর নিজস্ব অর্জিত সম্পত্তি বা উপহার সামগ্রী ছাড়া এক কথায় স্ত্রীধন ব্যতিত আর কোন সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্ব নারী পায় না। তবে খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের অধিকার প্রায় সমান।

মুসলিম প্রধান দেশ তুরস্ক, তিউনিশিয়াসহ আরও কয়েকটি দেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হিন্দু প্রধান দেশ ভারতে ধর্মীয় প্রথার অধিকাংশই বাতিল ও সংস্কার করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে যখনই উত্তরাধিকার আইনে পরিবর্তনের প্রশ্ন আসে তখনই সাম্প্রদায়িক শক্তির দোহাই দিয়ে সরকার এই আইনের পরিবর্তনে কোন ভূমিকা পালন করে না। বরং রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও শক্তিসমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। কারণ সর্বক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার চেয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার হীন স্বার্থে সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী রাজনীতি ও শক্তিসমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা করাই সব সরকার লাভজনক মনে করে। সরকারের এই হীন স্বার্থই প্রমাণ করে নারীর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি।

উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা জরুরি কেন? কারণ আইনের এই বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর অধস্তন অবস্থানকে বারবার স্মরণ করে দেয় যে, নারী রাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। সরকার নারীর অবদানের কথা পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৯ সালের তথ্য মতে, প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী সমান হলেও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীর অংশগ্রহণ বেশি প্রায় ৫৫ শতাংশ। ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে চিকিৎসা শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ প্রায় ৫৯ শতাংশ। এছাড়া শিক্ষক, বিজ্ঞানী, ব্যাংকার, গণমাধ্যমকর্মী, সংস্কৃতিকর্মী, রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর বিচরণ দৃশ্যমান। গৃহস্থালি শ্রমে নারীর অংশগ্রহণ দ্বিগুণ হলেও তার কোন স্বীকৃতি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নেই। কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতে নারীর অংশগ্রহণ বেশি। গার্মেন্টস শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ পূর্বে বেশি থাকলেও বর্তমানে তা কমে ৫৩ ভাগ হয়েছে। নিজ কর্মক্ষেত্রের বাইরে নারী পরিবারে রান্না, সন্তান লালন-পালনসহ গৃহস্থালি কাজে প্রায় প্রতিদিন সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন।

ঠিক তার বিপরীতে আছে নারীর উপর ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে ৮৭ শতাংশ বিবাহিত নারী নিজ গৃহেই নির্যাতনের

শিকার হয়। বাল্যবিবাহের হার ৫৩ শতাংশ। ৮০ শতাংশ অবিবাহিত নারী যৌন হয়রানির শিকার। এছাড়া ধর্ষণ, গণধর্ষণ, যৌতুক ও এসিড নিক্ষেপের কারণে নারী হত্যার শিকার হয়। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় আইন ব্যর্থ। মূলত সরকারের পরিসংখ্যান মতে নারীর অগ্রগতি এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে হলেও পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনের এই বৈষম্য বিলোপ করতে হবে। রাষ্ট্রের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু উত্তরাধিকার আইনে পার্থক্য বিদ্যমান। তাই এই পার্থক্য দূরীকরণে উত্তরাধিকার আইনসমূহকেও দেওয়ানী আইন ও আদালতের আওতায় এনে ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রবর্তন করে পারিবারিক আইনের বৈষম্য দূর করতে হবে।

সরকার যদি সিডও সনদ, সংবিধান এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে সমাজে বিরাজমান বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে, তাহলে সমাজে নারীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিবর্তন ঘটবে। যদিও শ্রেণিবিভক্ত এই সমাজে রাষ্ট্র তার নিজের প্রয়োজনে আইন তৈরি করে। ফলে বিদ্যমান এই সমাজ কাঠামোতে সত্যিকার অর্থে নারীর সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা কতটা সম্ভব, সেই প্রশ্নও থেকে যায়। নারীর সত্যিকার মুক্তি কেবলমাত্র একটি শোষণহীন সমাজেই সম্ভব। তাই বিদ্যমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারী-পুরুষের মিলিত অংশগ্রহণই আমাদের কাম্য।

লেখক: নারী অধিকার কর্মী
সম্পাদক, নারী ভাবনা

নারী-পুরুষ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে প্রয়োজন পারিবারিক সম্পত্তিতে সম-অংশীদারত্বের আইন প্রণয়ন

অদিতি জামান

১. "কাজে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে, তার আবার..."

২. "ব্যাংকিং ক্যারিয়ারের ৪ বছরে দেখলাম, যত বিবাহিত মেয়ে একাউন্ট ওপেন করতে আসে বা ডিপিএস সঞ্চয়পত্র কিনতে আসে, ৯০% মেয়ে বা মহিলা তার স্বামীকে নমিনি দিতে চায় না, নমিনি দেয় তার বাবা-মা অথবা ভাই-বোনকে! কিন্তু বিবাহিত পুরুষদের ৯৫%-ই স্ত্রীকে নমিনি দিতে চায়।"

৩. "আমিও একটি সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত। চাকরি ছেড়ে সংসার সামলাতে রাজি আছি; কিন্তু পরে যদি স্বামী ডিভোর্স দেয়, তাহলে আমার আর্থিক নিরাপত্তা কী হবে? তাই স্বামীর কোম্পানির অর্ধেক শেয়ার চেয়ে কি ভুল করেছি?"

প্রথম উদ্ধৃতিটি বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে। অভাবের সংসারে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে কুঞ্জ স্ত্রী রাধিকাকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে এই কথাটা বলে অপমান করে আঘাত করার জন্য। সাহিত্যিকরা জীবন, দেশ ও সমাজের প্রতিচ্ছবিই তুলে নিয়ে আসেন তাদের লেখায়। রাজনীতি ও সমাজ সচেতন বিজন ভট্টাচার্যও তা-ই করেছেন তার নাটকের সংলাপে এই প্রবচনটিকে স্থান দেওয়ার মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, রোজগেরে-গৃহিণী নির্বিশেষে সকল স্তরের নারীদেরই কম-বেশি তাদের বিবাহিত অংশীদারের কাছ থেকে জীবনের কোন-না-কোন সময় হুবহু এই কথা না শুনলেও কাছাকাছি এই রকমই কিছু একটা শুনতে হয়। আমি নিজে একজন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া উচ্চশিক্ষিত বড় সরকারি চাকুরে। আমাকেও বিবাহিত অংশীদারের কাছ থেকে বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অতর্কিতে অনেকটা এমন কথাই শুনতে হয়েছে। শুনতে হয়েছে আমি কেবল দুইটা কাজই পারি, 'খাইতে আর ঘুমাইতে'।

মনস্তত্ত্ববিদ ও দার্শনিক লাকা'র মতে– মানুষ রাগের মাথায়, ঠাট্টা-মশকরায় অবচেতন মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা কথাই মুখ ফসকে বলে ফেলে। তাই পুরুষ

যখন কোন বিশেষ মুহূর্তে তাদের বিবাহিত অংশীদারকে ‘অকর্মণ্য’ ও ‘পেটুক’ বলে খোটা দেয়, সেটা পুরুষের নারী সম্পর্কে যুগ যুগ ধরে চলে আসা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বদ্ধমূল ধারণাকেই প্রকাশ করে মাত্র। নারীর গৃহকর্মের যেহেতু নগদ কোন অর্থমূল্য নেই, কাজেই তাদের কাজ কোন কাজই না। তাই তারা কেবল বসে বসে অন্ন ধ্বংস করেন বলে মনে হয় তাদের কাছে।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির কথাগুলো গত কয়েক বছর ধরে ফেসবুকে ঘুরে বেড়ানো একজন ব্যাংকারের লেখা ফেসবুক পোস্টের একটা অংশ। লেখাটা কত হাজার শেয়ার হয়েছে বলা মুশকিল। লেখাটা অসংখ্যবার ফেসবুক ফিডে এসেছে। আমার ধারণা ফেসবুক ব্যবহারকারী খুব কমজনই পাওয়া যাবে, যার ওয়ালে এই লেখাটা আসেনি। এর মানে অনেকেই এই কথাগুলোর সাথে একমত। তারাও নিজেদের ব্যক্তিজীবনে একই রকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। তারাও মনে করেন, বিবাহিত রোজগেরে নারীরা তাদের উপার্জনকে সংসার তথা বিবাহিত অংশীদারেরও আয় হিসাবে দেখতে পারেন না কিংবা দেখেন না। নিজের একার অর্জন বলে মনে করেন এবং ভাই-বোন, বাবা-মা’র পিছনেই উপার্জিত অর্থ খরচ করেন। অথচ পুরুষ তার বিপরীতটা ভাবেন এবং করেন। আসলেই কি তাই? অধিকাংশ পুরুষ তাদের সম্পত্তি ও উপার্জন বিবাহিত নারী অংশীদারের পদতলে সমর্পণ করে দেন কি? তাহলে ‘অভাগার গরু মরে, ভাগ্যবানের মরে বউ’ প্রবাদ প্রবচনটির উৎপত্তি হল কেন? ব্যাংকে নমিনি করা মানেই কিন্তু নমিনির টাকার মালিক হয়ে যাওয়া নয়। অনেক সময় নমিনি জানতেও পারে না তাকে যে নমিনি করা হয়েছে, যদি না জানানো হয়। একাউন্ট হোল্ডারের মৃত্যু হলেই কেবল নমিনির কাছে অর্থের মালিকানা বর্তায়, অন্যথায় নয়।

ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবে দেখেছি। নারীদের এরকম কর্মকাণ্ড এবং মনোভাবের নেপথ্যে অনেক কিছুই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রতিবারই একটা বিষয়কেই প্রধান কারণ বলে মনে হয়েছে। সেটা হল, নারী তার অর্জিত অর্থ-সম্পত্তিকে বিবাহিত অংশীদারেরও অর্থ বলে ভাবতে পারেন না মূলত নানান কারণে বিবাহিত পুরুষ অংশীদারের অর্থ-সম্পত্তিকে তার নিজের বলে ভাবতে পারেন না বলে। ভাবার মতো বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি খুব কম সময় খুব কম নারীই পান বলে। খুব বেশি দিন তো হয়নি যে, নারীরা ঘরের বাইরে কাজ করে কাঁচা টাকা উপার্জন করতে পারছেন। আর আমাদের দেশে উপার্জনক্ষম নারীর সংখ্যাও এখনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ না। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া নারীর হাতে অনেক হিসাব করেই টাকা দেওয়া হয় খরচের জন্য। প্রতিবার চেয়ে-চিন্তে নিতে হয় টাকা। দিন-রাত সংসার-সন্তানের জন্য খেটেও বিচ্ছেদ হয়ে গেলে শূন্য হাতে ফিরতে হয় অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে নারীকে আজও। এমন আচরণ ও বাস্তবতা নারীর মনে নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিতে বাধ্য।

তৃতীয় উদ্ধৃতির কথাগুলোও স্যোশাল মিডিয়া থেকে নেওয়া একজন ধনী পুরুষের বিবাহিত অংশীদারের, যিনি নিজেও একজন উচ্চপদে কর্মরত নারী। ৬ বছর আগে এই দম্পতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন। সংসারে দুটি সন্তান রয়েছে। পুরুষ বিবাহিত অংশীদারটি নিজেও একটি কোম্পানির মালিক। বাড়িতে বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য কাজের লোক রয়েছে। সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে না পারা নিয়ে দুই বিবাহিত অংশীদারের মধ্যে দাম্পত্য বিবাদ শুরু হয়। এক পর্যায়ে সন্তানদের কথা ভেবে নারীটিকে চাকরি ছাড়ার কথা বলেন তার বিবাহিত অংশীদার।

নারীটি দ্বিধায় পড়েন। তিনি কয়েক দিন সময় চান। কয়েক দিন পরে নারীটি শর্ত দেন তার বিবাহিত অংশীদার নিজের কোম্পানির ৪৯ শতাংশ শেয়ারের মালিকানা তার নামে লিখে দিলে চাকরি ছেড়ে দিতে রাজি আছেন। এই শর্ত দেওয়ার পর তিনি নিজেই অস্বস্তিতে পড়েন। অস্বস্তি কাটাতে স্যোশাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে কাজটা ঠিক করেছেন কি না পাঠকদের কাছে জানতে চান। পুরুষটি তার বিবাহিত অংশীদারের পোস্ট দেখে প্রথমে কিছুটা বিরক্ত হলেও পরবর্তীতে শর্ত মেনে নিয়ে কোম্পানির অর্ধেক মালিকানা তাকে লিখে দেন। সংসারে শান্তি ফিরে আসে। ঘটনাটা নিয়ে ২৮ জুন ২০২৪ দৈনিক 'যুগান্তর' স্যোশাল মিডিয়া ক্যাটাগরিতে 'চাকরি ছাড়তে বলায় স্বামীর প্রতিষ্ঠানের অর্ধেক মালিকানা দাবি স্ত্রীর, অতঃপর...' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করে।

অনেক পুরুষ তো বটেই, ঘরে ও ঘরের বাইরে কাজ করে যেসব নারী অর্থ উপার্জন করেন অর্থাৎ চাকরি-ব্যবসা ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত আছেন, তারাও অনেকেই গৃহিণীদের কম গুরুত্ব দেন। রাষ্ট্রেরও তেমন কোন মাথাব্যথা দেখা যায় না গৃহিণীদের আর্থিক নিরাপত্তা, ঘরের কাজের আর্থিক স্বীকৃতি, তাদের জীবনের নিরাপত্তা ইত্যাদি নিয়ে। নারীরা কতগুলো বাস্তবতার কারণে সরাসরি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত না হয়ে কখনও স্বেচ্ছায় গৃহিণী হোন, আবার কখনও গৃহিণী হতে বাধ্য হোন। যথা:

- অনেক উচ্চশিক্ষিত নারী বিয়ের আগে বিবাহিত অংশীদার ও তাদের পিতৃপক্ষের লোকদের সাথে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ঘরের কাজ, সন্তান লালন-পালন এবং পরিবারের সদস্যদের যথাযথ টেককেয়ার করার জন্য গৃহিণী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

- বিয়ের পরও ঘরের বাইরে কাজ করতে চান অনেক নারী। তবে বিবাহিত অংশীদার ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অসম্মতির জন্য সংসার টেকাতে গৃহিণীর জীবন বেছে নেন তারা।

- মনের মতো বেতন ও কাজ না পাওয়ায় অনেক নারী গৃহিণীর জীবন বেছে নেন।

- অনেকে সংসার দেখাশোনা, সন্তান লালন-পালন ও চাকরি একসাথে করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যান। এরকম অবস্থায় কখনও কখনও বিবাহিত অংশীদার এবং নিজের ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সহযোগিতার অভাবে চাপে পড়ে সংসার-সন্তানের মুখ চেয়ে চাকরি ছেড়ে গৃহিণীর জীবন বেছে নেন।

- সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্তান লালন-পালনের আধুনিক, নির্ভরযোগ্য ও সহজলভ্য ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় অনেক নারী কর্মজীবী জীবন বেছে নিতে পারেন না।

- কেউ কেউ আবার মনে করেন ঘরের বাইরে কাজ করা নারীদের উচিত না। পুরুষ বাইরে থেকে উপার্জন করে নিয়ে আসবে আর সন্তান লালন-পালন থেকে ঘরের সার্বিক কাজ করবে নারীরাই। এজন্য কোন কোন নারী স্বেচ্ছায় গৃহিণীর জীবন বেছে নেন।

- স্বামী-স্ত্রী দুজনের কর্মস্থলের দূরত্বের জন্য কেউ কেউ কাজ ছেড়ে দিয়ে গৃহিণীর জীবন বেছে নেন।

- কোন কোন নারী বাইরে গিয়ে চাকরি বা ব্যবসা না করলেও ঘরে থেকেই টুকিটাকি কাজের মাধ্যমে ভালো উপার্জন করছেন এবং সংসারে অর্থনৈতিক অবদান রাখছেন।

নারীরা গৃহ ব্যবস্থাপনার কাজকে যেই কারণেই গ্রহণ করুন না কেন– গৃহ ব্যবস্থাপনার কাজকে মোটেও অপ্রয়োজনীয়, গুরুত্বহীন, অর্থহীন, অসম্মানজনক বলে মনে করার কিছু নেই– যা আমাদের সমাজ-মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্র-মনস্তত্ত্ব এবং চারপাশে তাকালে আমরা সর্বত্র দেখতে পাই। ঘরে বা ঘরের বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত নন এমন কোন নারীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কী করেন? দেখা যায় উনারা কেমন একটা অস্বস্তিতে পড়ে যান এবং অবশেষে বলেন উনারা কিছুই করেন না! এমন মায়েদের সন্তানদের কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, তাদের মা কী করেন? তারাও বলে, তাদের মা কিছুই করেন না! পরিবার ও সমাজের অন্য সদস্যরাও এমনটাই মনে করে থাকে সাধারণত। গৃহিণীদের প্রতি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করা দরকার।

> **“**
>
> **মূলত নারীদের ঘরের বাইরে কাজ করার মধ্যে সম্মান-অসম্মান ও স্বাধীনতার প্রশ্ন যতটা না জড়িত তারচেয়ে অনেক বেশি জড়িয়ে রয়েছে প্রয়োজনের প্রশ্ন, দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রশ্ন।**

আসলেই কি গৃহিণী নারীরা কিছুই করেন না? একটা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা উৎপাদন কাঠামো ও শিক্ষা ব্যবস্থা সেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি তথা অর্ধেক নাগরিক নারীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় মনস্তত্ত্ব, সমাজ-মনস্তত্ত্ব কেমন হবে সেটা নির্ধারণ করে দেয়। তেমনি নারীরা গৃহিণীর জীবন বেছে নিবেন নাকি কর্মজীবীর জীবন বেছে নিবেন, সেটাও অনেকটা নির্ধারিত হয় দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরই। তাই একটা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গৃহিণীর জীবন বেছে নেওয়ার অনুকূল করে রেখে নারীরা গৃহিণীর জীবন বেছে নেওয়ায় তাদের কাজকে হেয় করা, গুরুত্বহীন ছোট মনে করাকে ভিক্টিম ব্লেইমিং বলেই মনে করি। অথচ আমাদের সমাজ বাস্তবতায় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আজও গৃহিণীরা তাদের রোজগার করা বিবাহিত অংশীদারের চেয়েও প্রতিদিন প্রায় দ্বিগুণ কাজ করে থাকেন। তারা সংসারের যাবতীয় কাজ করেন। ক্ষেত্র বিশেষে কাজ পরিচালনা করেন, সহযোগিতা করেন এবং সন্তানদের লালন-পালন, তাদের পড়াশোনার খোঁজ-খবর, আত্মীয়-স্বজন, পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা থেকে শুরু করে সবই করেন।

মূলত নারীদের ঘরের বাইরে কাজ করার মধ্যে সম্মান-অসম্মান ও স্বাধীনতার প্রশ্ন যতটা না জড়িত তারচেয়ে অনেক বেশি জড়িয়ে রয়েছে প্রয়োজনের প্রশ্ন, দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রশ্ন। ইউরোপে উনিশ শতকে শিল্পের ব্যাপক বিকাশ, ১৮৩৭ ও ১৮৭০-এর অর্থনৈতিক মন্দা, আমেরিকার

গৃহযুদ্ধে (১৮৬১-১৮৬৫) কর্মক্ষম পুরুষদের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন ইত্যাদি কারণে নারী ও শিশুদের কারখানাগুলোতে কাজে যোগদান করা ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। বাংলাদেশেও বর্তমানে যেসব নারী গার্মেন্টস কারখানায়, নির্মাণ শিল্পে, ইটভাটা, মিডিয়া, অফিস-আদালত ইত্যাদিতে কাজ করছেন সেটাও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা উৎপাদন ব্যবস্থা বিকাশের কিছুটা ধারা তৈরি হয়েছে বলেই সম্ভব হয়েছে। তাই যতদিন পর্যন্ত নারীদের উৎপাদনের সাথে তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়ার বাস্তবতা রাষ্ট্র তৈরি করতে না পারছে ততদিন তাদের সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে।

গৃহিণীরা ঘরের যাবতীয় কাজ ও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন বলেই তাদের বিবাহিত অংশীদাররা ঘরের বাইরে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন, অর্থ উপার্জন করতে পারেন। অথচ তারা স্বামীর জীবিতাবস্থায় সেই সম্পত্তির অংশীদার হতে পারেন না, অংশীদার বলে বিবেচিত হোন না। বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে একদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধ নারীকে পিতার সম্পত্তি থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করে, মুসলিম নারীকে অর্ধেক অংশীদার করার মধ্যমে পুরোপুরি বঞ্চিত করার সুযোগ তৈরি করে দিয়ে রাষ্ট্র গৃহিণীদের সবচেয়ে নাজুক অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সংসারে সারা দিন-রাত খেটেও, অবদান রেখেও তারা প্রচণ্ড নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে সারা জীবন অতিবাহিত করেন। পান থেকে চুন খসলেই আতঙ্কের মধ্যে থাকেন, এই বুঝি স্বামীগৃহ থেকে উচ্ছেদ হবেন। অনেক পুরুষ এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাও গৃহিণীদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নেন।

একদিকে দেশে শিক্ষিত ও চাকুরে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে সংসারে দাম্পত্য কলহ ও বিচ্ছেদের সংখ্যাও বাড়ছে। পিতৃতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ব্যবস্থায় সমাজে যে পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে, তাতে এটাই আমাদের নিয়তি। শিক্ষিত, আধুনিক ও রোজগেরে নারী পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিবে এবং মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিবে এটাই তো স্বাভাবিক। এজন্য পিতৃতন্ত্রের রক্ষক প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী নারীকে শিক্ষা ও চাকরি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে চান। কিন্তু ইতিহাস ও উৎপাদন ব্যবস্থা তো পিছনে ফিরে যাওয়ার বিষয় না। এসবের মধ্য দিয়ে নারীর জীবনকে বিষিয়ে তোলা যাবে হয়তো কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু সমস্যার সমাধান মিলবে না। পিতৃতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সমূলে উৎপাটনেই এই সমস্যা সমাধানের প্রাণভোমরা লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু যতদিন না সেই প্রাণভোমরার দেখা মিলছে পারিবারিক সম্পত্তিতে (পৈতৃক সম্পত্তি ও বিয়ের পরে বিবাহিত অংশীদারদের অর্জিত সম্পত্তি) নারী-পুরুষ উভয়ের সমান মালিকানা সেই সমস্যার সমাধান কিছুটা হলেও দিতে পারে। বিচ্ছেদ হয়ে গেলে কিংবা কেউ কাউকে ছেড়ে চলে গেলেও বিয়ের পর উভয়ের অর্জিত সম্পত্তি যেহেতু ভাগাভাগি হবে, এতে পরস্পরের সাথে দূরত্ব ও অবিশ্বাস দূর করবে। একইভাবে দূর করবে পুরুষের উপর নারীর আস্থাহীনতাকেও। ঘোচাতে সাহায্য করবে নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া পুরুষের একক আধিপত্যকেও। উন্নত দেশগুলো সেই পথই বেছে নিয়েছে অনেক আগেই। এমনকি তুরস্কের মতো মুসলিম দেশও পুত্র ও কন্যা সন্তান উভয়ের জন্যই বাবা-মায়ের সম্পত্তির সমান অংশীদারত্ব নিশ্চিত করেছে। শুধু তা-ই না, বিয়ের পরে অর্জিত সম্পত্তির সমান অংশীদার হোন নারী-পুরুষ

উভয়েই সেখানে। বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও উভয়ই পরস্পরের সম্পত্তির অংশ পেয়ে যান। তুরস্কে বিয়েতে এজন্য দেনমোহরের প্রথাও নেই।

বিয়ের পর অর্জিত সম্পত্তির সম-অধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে মূলত আক্ষরিক অর্থেই সংসারে উভয়ের সমান ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়া যাবে। এতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও অধীনতার প্রশ্ন থাকবে না। তুমি বাইরে কাজ করো, আমি ঘরে কাজ করি– ব্যস, সমান সমান। উদ্বৃত্ত আয়েও দুজনের সমান সমান ভাগ থাকবে। আর সেই আয়ের মালিক হওয়ার জন্য কারোরই মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার হবে না। বিচ্ছেদ হয়ে গেলেই পেয়ে যাবে। এর ফলে রোজগেরে নারীও চাইলে পুরুষের দায়িত্ব নিতে পারবে।

একতরফা সুবিধা পাওয়া যেকোন সম্পর্কই আধিপত্যমূলক ও বিপদজনক হতে বাধ্য। চাকরিজীবী নারীদের ঘায়েল করতে এবং নারীদের গৃহকোণে অবরুদ্ধ করে রাখতে ইদানিং প্রায়শই একটা যুক্তি দিতে দেখা যায়। সেটা হল চাকরি হলে পুরুষ নিজের সঙ্গিনীসহ একটা পুরো পরিবারের দায়িত্ব নেয়, কিন্তু নারী তো সেটা করে না। কিন্তু যেটা কেউ বলে না সেটা হল, এইভাবে একজন নারীর দায়িত্ব নেওয়ার সাথে নারী-পুরুষ উভয়েই একটা আধিপত্যমূলক সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। এটা পুরুষের দিক থেকে হলে যেমন বোঝাস্বরূপ ও অস্বাস্থ্যকর, তেমনি নারীর দিক থেকে হলেও। পুরুষ যেহেতু রোজগার করে এই সম্পর্কে পুরুষের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায়। বিয়ের পর অর্জিত সম্পত্তির সম-অধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে মূলত আক্ষরিক অর্থেই সংসারে উভয়ের সমান ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়া যাবে। এতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও অধীনতার প্রশ্ন থাকবে না। তুমি বাইরে কাজ করো, আমি ঘরে কাজ করি– ব্যস, সমান সমান। উদ্বৃত্ত আয়েও দুজনের সমান সমান ভাগ থাকবে। আর সেই আয়ের মালিক হওয়ার জন্য কারোরই মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার হবে না। বিচ্ছেদ হয়ে গেলেই পেয়ে যাবে। এর ফলে রোজগেরে নারীও চাইলে পুরুষের দায়িত্ব নিতে পারবে। যদিও অর্থনৈতিকভাবে কারও উপর নির্ভরশীল থাকা তথা উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, সেটা নারী কিংবা পুরুষ যে-ই হোক না কেন, কিছুটা আধিপত্যমূলক হতে বাধ্য। তবে পারিবারিক সম্পত্তিতে সম-অধিকারের আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করার মাধ্যমে সেই আধিপত্যকে অনেকটাই মিনিমাইজ করা সম্ভব।

গত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে বিপুল সংখ্যক নারী রাজপথে নেমে এসেছিল নিজেদের জন্য বরাদ্দ কোটা সুবিধাকে অস্বীকার করে। তারা দৃপ্তকণ্ঠে জানান দিয়েছিল অসম্মানজনক কোটা সুবিধা নয়, বরং বৈষম্যের উৎস যে ব্যবস্থা সে ব্যবস্থা বিলোপের। তাই নতুন বাংলাদেশে নারীর প্রতি হাজারটা বৈষম্যের মূল যে পারিবারিক আইন, সে আইনের সমতাভিত্তিক পরিবর্তন আজ সময়ের দাবি। পারিবারিক সম্পত্তিতে সম-অংশীদারত্বের আইন (পৈতৃক সম্পত্তি ও বিয়ের পরে বিবাহিত

অংশীদারদের অর্জিত সম্পত্তি) প্রণয়ন একদিকে শিক্ষিত ও রোজগেরে নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, নিরাপত্তাহীনতা, আস্থাহীনতা দূর করবে। অপরদিকে গৃহিণী নারীদের গৃহকর্মের আর্থিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এতে বিবাহিত জীবনে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই বিবাহিত অংশীদারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসবে। গৃহিণী নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। সারা জীবন ধরে থাকা তাদের মধ্যে আতঙ্ক দূর করবে। বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও খালি হাতে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পারি দিতে হবে না গৃহিণী নারীকে। এই আইনের ইতিবাচক প্রভাব আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পরতে পরতে ছড়িয়ে যাবে। সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষ সম্পর্কিত মনোভাবকেও আমূল পাল্টে দিবে।

লেখক: নারী অধিকার কর্মী

সম্পত্তিতে অধিকার এবং নারীর স্বাধীন অস্তিত্ব

মনিরুল ইসলাম

ডাক্তারি করার সুবাদে অনেক নারীকে রোগী হিসাবে পাই। তাদের বেশিরভাগ বিবাহিত। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমনকি সচ্ছল পরিবারের অনেক নারীই বলেন তাদের স্বামী বা পরিবারের পুরুষ সদস্য (যার উপর তিনি অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল) চিকিৎসার খরচ দিতে রজি নন, মানবিক সহযোগিতা দিতে রাজি নন। তিনি তার বাবা কিংবা তার বাবা-মায়ের পরিবারের কারও সহায়তা নিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন। যারা সেই সহায়তাও পান না তাদের অনেকের পক্ষে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। পরিবারের সক্ষমতা সত্ত্বেও নারীরা পরিবারে এ ধরনের অমানবিকতা, বৈষম্য ও অপ্রাপ্তির মধ্যে থাকেন। তার কারণ পরিবারে ও সমাজে তাদের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। স্বাধীন অস্তিত্ব বলতে একজন মানুষের চলাফেরার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ইচ্ছা অনুযায়ী তার প্রয়োজনীয় সবকিছু অর্জনের সক্ষমতাকে বোঝায়। স্বাধীন অস্তিত্ব ছাড়া কারও পক্ষে পরিপূর্ণ মানবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়।

সমাজে মানুষের স্বাধীন অস্তিত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি আর্থিক সক্ষমতা। অর্থাৎ অর্থ অর্জন ও ব্যয় করার উপর নিজের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা। আমাদের সমাজে পূর্ণবয়স্ক মানুষের মধ্যে যাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই তাদের বেশিরভাগ নারী এবং সমাজের অধিকাংশ নারীর স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের আর্থিক সক্ষমতা নেই। তাদের জীবনের বেশিরভাগ দুঃখ-কষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ পুরুষের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা। সমাজে অধিকাংশ পুরুষের অর্থ উপার্জন ও ব্যয় করার স্বাধীনতা রয়েছে, অপরদিকে এ যুগেও খুব অল্প সংখ্যক নারী এই স্বাধীনতা ভোগ করেন।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ১৭৭৬ সালে (যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হয়) প্রথম উচ্চারিত হয় সকল মানুষই জন্মগতভাবে সমান (Every man is born equal)। এই 'সকল' মানুষের মধ্যে কি নারীরা ছিল? ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব সকল মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক সম-অধিকারের প্রশ্নটি জাগিয়ে তুললো। এই 'সকল' মানুষের মধ্যে নারীরা কতটা ছিল? কারণ এরও অনেক বছর পর ১৯১৭

সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং ১৯২০ সালের পর অন্যান্য কিছু পুঁজিবাদী দেশে নারীরা প্রথম ভোটাধিকার পায়। ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় জন্মগতভাবে সকল মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা পাবার কথা বলা হলেও এই ঘোষণা (আর্থ-সামাজিক মানদণ্ডে) উন্নত দেশগুলোতেও নারী-পুরুষের বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারেনি। না পারার প্রধান কারণ পরিবারে ও সমাজে নারীর স্বাধীন অস্তিত্ব (যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি আর্থিক স্বাধীনতা) গড়ে না ওঠা। উপার্জন ছাড়াও আর্থিক সক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি পরিবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সম্পত্তির সিংহভাগের মালিকও পুরুষ। অতএব নিজের প্রয়োজনের জন্য বেশিরভাগ নারীই পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপর নির্ভরশীল। এই বাস্তবতা থেকেই জন্ম নেয় নারী জীবনের অসংখ্য করুণ কাহিনী। সক্ষম ও সচ্ছল পরিবারের অসংখ্য নারীকেও করুণা ও অবহেলার পাত্র হয়ে শখের জিনিস তো দূরের কথা, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ও জরুরি অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তাই সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের বিষয়টি তার স্বাধীন অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই।

> **যে দেশের সংবিধান ও আইন কোন ধর্মীয় রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেদেশে কেবল উত্তরাধিকার আইন (যা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক) কেন ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী হতে হবে?**

সম্পত্তির অধিকার এবং নারীর বঞ্চনার বাস্তবতা

আর্থিকভাবে সচ্ছল পিতা-মাতার সন্তানেরা সম্পত্তির একটি বড় অংশ অর্জন করেন উত্তরাধিকার সূত্রে। আমাদের সমাজে বেশিরভাগ নারী নিজেরা আয় করেন না। এইসব ব্যাপক অধিকাংশ নারীর উত্তরাধিকার ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সম্পত্তি অর্জনের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। এদেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা লেখা থাকলেও সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নেই। ঔপনিবেশিক আমল থেকে অন্য সব ক্ষেত্রে সিভিল আইন প্রযোজ্য হলেও পারিবারিক বিষয়গুলোতে প্রচলিত রয়েছে ধর্মীয় আইন। ১৯৬১ সালে প্রবর্তিত মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী মুসলিম পরিবারের নারী সন্তান বাবার সম্পত্তিতে পুরুষ সন্তানের অর্ধেক এবং স্বামীর সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনত প্রাপ্য এই অংশ থেকেও পরিবারের পুরুষ সদস্যগণ নারীদের বঞ্চিত করেন। এদেশে প্রচলিত হিন্দু পারিবারিক আইন অনুযায়ী পিতার পুরুষ সন্তান থাকলে হিন্দু নারীরা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হোন। যেহেতু বেশিরভাগ হিন্দু বিয়ের রেজিস্ট্রি করা হয় না, তাই স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের আইনগত অধিকার দাবি করা সম্ভব হয় না। যে দেশের সংবিধান ও আইন কোন ধর্মীয় রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেদেশে কেবল উত্তরাধিকার আইন (যা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক) কেন ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী হতে হবে? সংবিধানের মৌলিক ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক এই বৈষম্যমূলক আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজের পুরুষতান্ত্রিক কায়েমি স্বার্থবাদীদের দ্বারা, যারা ধর্মের নামে এই বৈষম্যমূলক আইন টিকিয়ে রাখতে অত্যন্ত সোচ্চার। অথচ অধিকাংশ নারী যখন

প্রচলিত ধর্মীয় আইনের বিধান অনুযায়ী প্রাপ্য সম্পত্তিটুকুও পান না, সে ব্যাপারে তারা কোন উচ্চ বাচ্য করেন না।

> **দাস সমাজের বিধান অনুযায়ী দাসমালিকেরা ছিল ক্রীতদাসের দেহ ও সম্পদের আইনগত মালিক। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বর্তমানেও আমাদের পরিবারগুলোতে অধিকাংশ পুরুষেরা বিশেষত স্বামীরা নিজেদেরকে স্ত্রীর 'দেহ ও সম্পদের আইনগত মালিক' বলে মনে করেন।**

পরিবারের সম্পত্তির কিছু অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার আইনগত অধিকার থাকলেও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং রীতি-নীতির দাপট থাকার কারণে বাস্তবে পরিপূর্ণভাবে সম্পত্তির অধিকার এবং আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করা অধিকাংশ নারীর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এখনও আমাদের সমাজে বেশিরভাগ নারীর খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়। বিয়ের পর এদের পক্ষে লেখাপড়া করা কিংবা কোন একটি পেশায় দক্ষতা অর্জন করা এর কোনটাই আর হয়ে ওঠে না। গৃহস্থালি ও সন্তান পালনের চক্রে 'গৃহবন্দী' এই গৃহবধূ নারীদের ব্যাপক অংশ ঘরের বাইরের জগৎ সম্পর্কে খুব বেশি অবহিত নন। অতএব জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকাংশ বিষয়ে তারা সাধারণত পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপর নির্ভরশীল থাকেন। এই নির্ভরশীলতার সুযোগ নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের নারী সদস্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং সেগুলো থেকে অর্জিত আয়ের অর্থের নিয়ন্ত্রণ পুরুষ সদস্যদের হাতে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় পরিবারের কর্তৃত্বশীল পুরুষ সদস্যের 'অনুমোদন' ছাড়া নারী তার নিজের মালিকানাধীন অর্থ বা সম্পদ ব্যয় করতে পারছেন না। দাস সমাজের বিধান অনুযায়ী দাসমালিকেরা ছিল ক্রীতদাসের দেহ ও সম্পদের আইনগত মালিক। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বর্তমানেও আমাদের পরিবারগুলোতে অধিকাংশ পুরুষেরা বিশেষত স্বামীরা নিজেদেরকে স্ত্রীর 'দেহ ও সম্পদের আইনগত মালিক' বলে মনে করেন। অতএব নারীর আর্থিক সক্ষমতার জন্য কেবল সম্পদ ও অর্থ অর্জন নয়, তার উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং সঠিকভাবে এগুলো ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন করাও জরুরি।

এই অর্জন এখনও খুব সহজ কোন বিষয় নয়। সমাজে বেশিরভাগ নারীই 'নিজের ঘর' (Home) নামের এক পারিবারিক খাঁচায় বন্দী থাকে। সামাজিক বয়ান হল এই ঘর বা পরিবার নারীর আশ্রয়, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও আরাম-আয়েশের স্থান। অর্থাৎ এটা নারীকে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু পরিবার নারীকে আবদ্ধ করে নানা রকম বাধ্যবাধকতায়। পরিবারে পুরুষ নারীদের কাছ থেকে যৌন, আবেগগত, গৃহস্থালি এবং প্রজননগত অব্যাহত সেবা চায় এবং নারীকে বাধ্য করে তাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিস পাওয়ার জন্য। পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে অধস্তন অবস্থায় থাকে বলে নারীরা এগুলো মেনে নেয়। মেনে নিতে না চাইলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সহিংসতার শিকার হোন। নারীকে তার অধস্তন অবস্থান ও অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের মধ্যে রাখার ক্ষেত্রেও পুরুষতান্ত্রিক পরিবার ও সমাজের কাছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে সহিংসতা ও নিপীড়ন। এ সমাজে

মোটের উপর প্রতি তিনজনে একজন নারী সহিংসতা ও নিপীড়নের শিকার হোন এবং তাদের ব্যাপক অধিকাংশই এগুলোর ভীতি ও হুমকির মধ্যে থাকেন। নারীর উপর সংহিসতার মধ্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর সব অপরাধ। যেমনঃ ধর্ষণ, পারিবারিক সহিংসতা, মেয়ে ভ্রূণ হত্যা, যৌতুকের কারণে হত্যা, নারী পাচার, এসিড নিক্ষেপ, সম্মান রক্ষার্থে হত্যা (তালিকা আরও দীর্ঘ)। সম্ভাব্য অপরাধীরা প্রায়ই স্বামী, বাবা, ছেলে, বন্ধু ইত্যাদি মুখোশের আড়ালে থাকে। মানব সমাজের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, যেকোন অসম ক্ষমতা-সম্পর্ককেই টিকিয়ে রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত সহিংসতা ও নিপীড়নের উপর অথবা এগুলোর হুমকির উপর নির্ভর করতে হয়। পরিবারে নারীর উপর সহিংসতা ও নিপীড়নের এই ব্যাপকতা প্রমাণ করে বেশিরভাগ পরিবার এখনও প্রবলভাবে পুরুষতান্ত্রিক।

শুধু বলপ্রয়োগ নয়, নারীকে বাধ্যগত রাখার জন্য পরিবার ও সমাজে তাদের মগজও ধোলাই করা হয়, যা সকল অসম ক্ষমতা-সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রেই করা হয়। পরিবার মেয়েদের পড়ালেখা ও জ্ঞানার্জনকে নিরুৎসাহিত করে, অনেক ক্ষেত্রে বাধাও দেয়, যাতে তাদের 'পাখা গজাতে' না পারে। ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় ও 'স্ত্রী শিক্ষা'র নামে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক সম্পর্কে পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা মেয়েদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়। বাধ্য ও অনুগত নারীকে 'আদর্শ নারী' হিসাবে এবং বারবার তুলে ধরা হয় নারী স্বাধীনতার বিপদসমূহকে। পর্দাপ্রথা নারীকে অবরুদ্ধ করে একটি গণ্ডির মধ্যে। এই প্রথা কেবল ড্রেসকোড বা শরীর ঢাকার বিষয় নয়। "পোশাক ছাড়াও পর্দার আরও গুরুত্বপূর্ণ দুটি অংশ রয়েছে। একটি হল নারীকে পারিবারিক চৌহদ্দি বা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থাকতে বাধ্য করা। অন্যটি হল পাবলিক প্লেসেও (যেমনঃ কোন অনুষ্ঠান বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান) নারীদের পুরুষের থেকে আলাদা রাখা। অর্থাৎ ড্রেসকোড মেনেও গণ্ডির বাইরে যাওয়া কিংবা 'পরপুরুষ' বা অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে মেশা বা কথা বলা, কোন পুরুষ সঙ্গী ছাড়া একা একা কোথাও যাওয়া ইত্যাদিরও অনুমোদন নাই এই প্রথায়।"

অতএব, পরিবার ও সমাজে নানাভাবে অবদমিত নারীদের মধ্যে যারা পারিবারিক সূত্রে বা অন্য কোন উৎস থেকে সম্পত্তি অর্জন করেন তাদের জন্যও এই সম্পত্তি ভোগ করা বা এর মাধ্যমে তার আর্থিক সক্ষমতা অর্জন কিংবা অস্তিত্বের স্বাধীনতা অর্জন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কখনও সামাজিক ও পারিবারিক অবদমনের কারণে, কখনও পুরুষের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে 'খাঁচার পাখি'র মতো 'উড়তে না পারার' কারণে।

পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধেই নারীর আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের সংগ্রাম

আর্থিক সক্ষমতা নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্জন, কারণ এটি তাকে একটি স্বাধীন অস্তিত্ব দেয়। এই স্বাধীন অস্তিত্ব ছাড়া কোন মানুষই পরিপূর্ণ মানবিক জীবন পায় না। তাই পারিবারিক সম্পত্তি বা নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ অর্জন করলেই হবে না, আর্থিক সক্ষমতার জন্য অর্থ অর্জন ও ব্যয় করার উপর নিজের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব থাকতে হবে। এই কর্তৃত্ব নারীকে তার জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো ইচ্ছা অনুযায়ী পাওয়ার স্বাধীনতা দেবে। সমাজ ও পরিবারের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতি-নীতি তাদের এই কর্তৃত্ব অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এই সকল অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতি-নীতির স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা

অর্জন এবং এর বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে এই কর্তৃত্ব অর্জন করা যাবে না। নিজে উপার্জন করেন বা না করেন, পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে একজন স্ত্রী বা মায়ের অর্থ ব্যয়ের স্বাধীনতা তার অধিকার। যিনি টাকায় অর্থ উপার্জন করেন না তিনি তার শ্রম ও মেধা দিয়ে গৃহস্থালি ও সন্তান পালনের যে কাজ করেন তার অর্থমূল্য বিবেচনা করলে বোঝা যায়, তিনি কতটা আয় করেন। পুরুষতান্ত্রিক পরিবার তার কাজের অর্থমূল্যকে স্বীকৃতি দেয় না। বেশিরভাগ গৃহবধূ নারীরা তাদের এই অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন। এরচেয়েও দুঃখজনক ব্যাপার হল, পরিবারের খাঁচায় আবদ্ধ ব্যাপক অধিকাংশ নারী মনে করেন এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব না। তাদের এই ধারণা ও বিশ্বাস বদলাতে হবে। সংগ্রামী হবার প্রথম ধাপ হল সচেতনতা।

উত্তরাধিকার আইন ও এর প্রয়োগে নারীর প্রতি যে বৈষম্য রয়েছে, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাস্তবতাই এর উৎস। তাই সমাজ ও পরিবারে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস দূর না করে, সমাজের সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অসম সম্পর্কের অবসান না ঘটিয়ে, শুধু আইনের পরিবর্তন করলেই নারীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত আর্থিক স্বাধীনতা পাবেন না। আইনের বৈষম্য অবশ্যই দূর করতে হবে এবং সেটাও খুব সহজ কাজ নয়। তবে মানবিক জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সার্বিকভাবে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই।

লেখক: সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী

পুংকেশরের রাজনীতিঃ সম্পত্তিতে নারীর অধিকারহীনতা

নাদিয়া ইসলাম

লাইলী বেগমের বয়স ৩৮। তিনি মানিক মিয়ার বিধবা স্ত্রী এবং নরসিংহপুর গ্রামের চালের ব্যবসায়ী মৃত মোহাম্মদ মোতালেব হোসেনের প্রথম কন্যা। মৃত্যুর আগে মোতালেব তার চার কন্যার জন্য সম্পত্তি বিলি-বণ্টন করে যাননি। মোতালেবের মৃত্যুর পর বড় ভাই মোহাম্মদ আবুল হোসেনের দুই পুত্র মামুন ও উজ্জ্বল এখন তাদের চাচাতো বোনদের সম্পত্তির হিস্যা বুঝিয়ে দিতে নারাজ। ক্লাশ এইট পাশ অন্তঃসত্ত্বা লাইলী চাচাতো ভাই ও গ্রামের মেম্বারদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন (পড়ুন ভিক্ষা চাইছেন) নিজের প্রাপ্য অংশ বুঝে নিতে। বাবা মারা যাওয়ার ছয় মাস হয়ে গেছে, কোথাও কোন আশার চিহ্ন দেখছেন না তিনি।

ইন্দ্রাণী হালদার ঢাকার মিরপুর বাংলা কলেজে পড়েন। বিয়ে করেছেন তার বড় ভাইয়ের বন্ধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের শেষ বর্ষের বেকার ছাত্র তাহমিদুল ইসলাম দীপ্তকে, পরিবারের অমতে অবশ্যই। ইন্দ্রাণীরা দুই বোন এক ভাই। মুসলমান বিয়ে করে ম্লেচ্ছভূমে নিপাতিত হবার 'অপরাধে' বাবা-মায়ের সম্পত্তির একাংশও পাবেন না বলে তিনি শুনেছেন। মুসলমান বিয়ে না করলেও যে পেতেন, বিষয়টা তেমন সরলও না।

মিলি চাকমা তার পরিবারের প্রথম নারী যিনি শুধুমাত্র অন্তঃপুর আর রাঙামাটি শহরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিই পার হন নাই, তিনি স্কলারশিপ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মনাশ ইউনিভার্সিটিতে ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সে পিএইচডি করছেন। পিএইচডির মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়লে মিলি সেমিস্টার ড্রপ দেওয়ার ইচ্ছায় পরিবারের কাছে অর্থ সাহায্য চাইলে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে বলে জানিয়ে দেওয়া হয় বাবার সম্পত্তিতে তার কোন প্রকার অধিকার নাই বলে।

এই ঘটনাগুলোর একটাও মিথ্যা না। নাম-পরিচয় বাদ দিলে এগুলোর প্রতিটাই সত্য ঘটনা। এবং এরকম ঘটনা বাংলাদেশের প্রতি জেলায় জেলায় ইউনিয়নে ইউনিয়নে প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিদিন ঘটছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ২৭ বলছে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।" ধারা ২৮ (১) বলছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।" এবং ২৮ (২) ধারায় নারী-পুরুষের সমান অধিকারের অঙ্গীকার করা হয়েছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।" অথচ বাস্তবিক অর্থে সংবিধানের কোন প্রয়োগ বাংলাদেশের নারীর জীবনে নাই। সনাতনী এবং আদিবাসী তো অবশ্যই, আর্থ-সামাজিক শ্রেণি নির্বিশেষে মুসলমান নারী কাগজে-কলমে বাবা-মায়ের সম্পত্তির একাংশের উত্তরাধিকারী হলেও বেশিরভাগ সময়ই সম্পত্তি অর্থাৎ অধিকার বঞ্চিত হোন। আজকের দিন পর্যন্ত বাংলাদেশ সিডও সনদের ২ এবং ১৬ (১/গ) নম্বর ধারা সমর্থন করেনি। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও সনদ)-এর ২, ১৩ (ক), ১৬ (১/গ) ও ১৬ (১/চ) নম্বর ধারায় সংরক্ষণসহ অনুসমর্থন করে। পরবর্তীতে ধারা ১৩ (ক) এবং ১৬ (১/চ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হলেও কোরান ও সুন্নাহ পরিপন্থী বলে উপর্যুক্ত দুই ধারা বাংলাদেশ সংরক্ষণ করে আসছে আজকের দিন পর্যন্ত। সিডও সনদের ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রকে নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বন্ধ করতে এবং সমান অধিকার নিশ্চিতে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে এমন সংবিধান ও আইন তৈরি করতে হবে, যা তাদের পুরুষের সমান অধিকার দেয়। এছাড়াও ১৬ (১/গ) অনুযায়ী বিয়েতে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী যেন পুরুষের সমান অধিকার পান তা নিশ্চিত করতে হবে।

> **সুতরাং অবৈদিক সনাতন ধর্মে বলেন, কিংবা বৌদ্ধ ধর্মে–প্রাক-পুঁজিবাদী এই অঞ্চলে আমরা সর্বত্রই নারীশক্তির জয়জয়কার দেখেছি। দেখেছি নারীই উৎসমুখ। কিন্তু মূল সমস্যা শুরু হয় ঔপনিবেশিক আমলে। যখন একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান ঘটানো হচ্ছে, অন্যদিকে সামনে আনা হচ্ছে কট্টরবাদী ওয়াহাবি-সালাফি ইসলামকে, শুরু হচ্ছে সনাতনী-মুসলিম বাইনারি নির্ভর জাতিবাদী রাজনীতির রূপরেখা প্রণয়ন, শুরু হচ্ছে পুরুষের ক্ষমতায়নকে পূর্ণতা দেওয়ার প্রক্রিয়া।**

পাঠকের যদি খুব সম্প্রতি স্মৃতি বিস্মরণ না হয়ে থাকে তো জানার কথা বাংলাদেশ কোন ইসলামী রাষ্ট্র না, বরং বাংলাদেশ একটা গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র যার সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী সুন্নি মুসলমান। আকাশে সংসার না পাতলে পাঠকের এ-ও জানা থাকার কথা যে বাংলাদেশে মুসলমান ছাড়াও সনাতনী, খ্রিশ্চান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীসহ বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস। সুতরাং কোরান বা সুন্নাহর ধুয়া তুলে নারীদের অধিকার বঞ্চিত করার যে লৈঙ্গিক আধিপত্যবাদ কায়েমের রাজনীতি, তার বলির শিকার যে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর নারীরাও হচ্ছেন তা মাথায় রাখা বাঞ্ছনীয়।

কোরানের সুরা নিসার উদ্ধৃতি দিয়ে মুসলমানরা তাদের কন্যাদের তাদের ভাইদের তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি দেওয়াকেই ইনসাফ বা ন্যায্য বলে দাবি করে থাকেন। সুরা নিসার ১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। কিন্তু শুধু কন্যা যদি দুইয়ের অধিক থাকে, তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। আর মাত্র একজন কন্যা থাকলে তার জন্য (পুরো সম্পদের) অর্ধাংশ। এটা আল্লাহর নির্ধারিত অংশ।" বেশিরভাগ মুসলমান এই আয়াতের বৈধতা দেন নারীরা বিয়েতে দেনমোহর এবং বৈবাহিক অংশীদার (অর্থাৎ কি না স্বামী নামক প্রভু) মারফত সম্পত্তিতে ভাগ পান এই যুক্তিতে। অথচ যেই নারী বিবাহিত না, যেই নারীর বৈবাহিক অংশীদারের সম্পত্তি নাই, যেই নারী বিধবা– তাদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেই মুসলমান রণাঙ্গন সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে যাবে। এছাড়াও বিয়েতে প্রবেশের সময় দেনমোহর দেওয়ার কথা থাকলেও দেনমোহর বাস্তবিকভাবে কতখানি আদায় হয় সেটাও পরিসংখ্যানযোগ্য। মুসলমানরা আরও যেই বিষয়ে মুখে তালা মেরে কানে তুলা দিয়ে বসে থাকেন তা হচ্ছে বিবাহিত পুরুষের সম্পত্তিতে তার স্ত্রীর যতখানি অধিকার আছে, তার দ্বিগুণ অধিকার আছে বিবাহিত নারীর সম্পত্তিতে তার পুরুষ অংশীদারের তথ্যে। অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষের মৃত্যুর পর সন্তান থাকলে স্ত্রী ঐ সম্পত্তির ২ আনা, সন্তান না থাকলে ৪ আনা অংশীদার হোন। অপরদিকে স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্তান থাকলে বিবাহিত পুরুষ স্ত্রীর সম্পত্তির ৪ আনা, সন্তান না থাকলে ৮ আনা সম্পত্তির অংশীদার হোন। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও নারী পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তির ভাগীদার হচ্ছেন। এক্ষেত্রেও মুসলমানরা (কু)যুক্তি দেন এই বলে যে একজন পুরুষের যতখানি পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়, তার একাংশও একজন নারীকে নিতে হয় না। হ্যাঁ, এই আলাপ হয়তো আজকে থেকে পনেরো'শ বছর আগে সামন্তযুগে যুক্তিগ্রাহ্য ছিল, যখন যৌনাঙ্গের কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষের দায়িত্ব নির্ধারিত হতো। আজকে, এই একবিংশ শতকে নারী শুধুমাত্র তার যৌনাঙ্গ দিয়ে মানবশিশু ঠেলে বের করে তা কোলে নিয়ে পালঙ্কে কথা বলা বুলবুলি পাখি নিয়ে শুয়ে-বসে থাকেন না এবং পুরুষই একমাত্র ক্ষেতে গিয়ে ধানচাষ করে লাঙল ঠেলে গরু চড়িয়ে বাঘসিংহহাতিঘোড়া মেরে সমস্ত পরিবারের জন্য খাদ্য ও নিরাপত্তা যোগান দেন না। আজকের লগ্নিপুঁজির পৃথিবীতে পরিবারের অর্থ উপার্জনের জীবন-জীবিকার দায়িত্ব নারী-পুরুষ সকলের কাঁধে সমানভাবে জেঁকে বসে আছে। সুতরাং পনেরো'শ বছরের পুরানো নিয়ম দিয়ে ব্যক্তিগত বিশ্বাস চললেও যে আধুনিক গণপ্রজাতন্ত্রী একটা রাষ্ট্র ও তার আইন চলতে পারে না তা আমাদের বোঝা শুরু করতে হবে। এ-ও বুঝতে হবে যে এই রাষ্ট্রপদ্ধতিকে পশ্চিমা ভাবধারার বৈদেশি ঔপনিবেশিক অন্তরঙ্গ 'ওদের জলবায়ু স্বতন্ত্র' বলে গায়ের জোরে ঝেড়ে ফেলে দেবারও আমাদের উপায় নাই।

তার কারণ– বাংলাদেশ নামক বঙ্গদেশ পৃথিবীর আমবাগিচার বুকে একাকি ভাণ্ডবাটি আলাদা করে খেলতে বসা একটিমাত্র 'একলা চলো রে' রাষ্ট্র না।

এক্ষেত্রে মুসলমানদের চাইতে সনাতনী, খ্রিশ্চান বা আদিবাসীরা যে খুব উদার, লৈঙ্গিক আধিপত্যবাদী রাজনীতির বাইরে বের হয়ে সবাই যে খুব প্রগতিশীল আধুনিক সংস্কারপন্থী হয়ে গেছেন তা না। আমি এক্ষেত্রে ইংরেজিতে একটা কথা বলি, "Divided by religion, united by misogyny" বা বাংলায় "ধর্ম দিয়ে বিভক্ত, নারীবিদ্বেষে একজোট"– অর্থাৎ কিনা সম্পত্তিতে

নারীকে অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমান সনাতনী বাঙালি আদিবাসীর সমস্ত ঝগড়াঝাটি মিটে তারা আমেদুধেসন্দেশে মিশে একাকার ভাই ভাই হয়ে যান। তখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নাই, মেয়েদের হাতে পারিবারিক সম্পত্তি গেলে সেই মেয়েদের বিবাহিত (সম্ভাব্য বাঙালি মুসলমান পুরুষ) অংশীদারের হাতে সম্পত্তি চলে যাবে এই যুক্তিতে তারা তাদের মেয়েদের সম্পত্তি বঞ্চিত করে থাকেন। অথচ মেলবন্ধন বর্ণাশ্রম পারিবারিক পিতৃতান্ত্রিক আইন ঘটককারিকার প্রাগৈতিহাসিক ধর্মীয় সামাজিক রক্ষণশীল বাধা-নিষেধ অতিক্রম করে সনাতনীরা মুসলমানদের চাইতে অনেক যুগ এগিয়ে আছেন বলে যে দাবি করে থাকেন, বিয়ের মতো 'সঠিক' পদ্ধতিতে যৌনসঙ্গম করার লাইসেন্স দিয়ে 'বৈধ' সন্তান (পড়ুন ছেলে সন্তান) নামক সম্পত্তি রক্ষার শ্রমিক উৎপাদনের কারখানার বাইরে বের হয়ে ভালোবাসা নামক যে আকাশ থেকে ধূলির ধরায় এইমাত্র অবতীর্ণ হওয়া অনুভূতি আবিষ্কার করে ভালোবেসে ঘর বাঁধার যে উত্তম কুমার-সুচিত্রা সেনীয় সংস্কার করে দেশদশ উদ্ধার করে ফেলছেন বলে দাবি করেন, তা যে ফাঁপা বুলি তা সম্পত্তিতে অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে– শুধু তাদের নিয়ম উপেক্ষা করে নিজ বর্ণের বাইরে বের হয়ে বা বিধর্মী বিয়ে করলেই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। বর্ণপ্রথা বাতিল কি খুব যুগান্তকারী প্রগতিশীল আধুনিক ধর্মীয় আচার, এ নিয়ে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, ক'জন সনাতনী নিজ গোত্রের নিজ বর্ণের নিজ ধর্মের বাইরে বের হয়ে বিয়ে করেন? সেই সংখ্যাটা কত? তার বিপরীতে ক'জন সনাতনী নারী নিজ ধর্ম মতে বিয়ে করে মাথায় একহাত সিঁদুর দিয়ে শাঁখা-পলা পরে 'স্বামীদেবতা'র মঙ্গল প্রার্থনায় উপোস থেকেও পিতা-পিতামহের পুণ্যবলে তাদের কতখানি সম্পত্তির উত্তরাধিকার হোন? আদৌ হন কি? ক'জন নারী শ্বশুরের ও তাদের বিবাহিত অংশীদারের সম্পত্তিতেই-বা অধিকার পান? খুলনার রাজবিহারী মণ্ডলের মৃত ছেলের বউ গৌরী দাসীকে সম্পত্তি বঞ্চিত করার মামলার খবর আমরা পত্রিকায় পড়েছি। ১৯৮৩ সালে নিম্ন আদালতে দায়ের করা গৌরীকে সম্পত্তি বঞ্চিত করার মামলা প্রথমে খারিজ হয় ১৯৯৬ সালে, পরবর্তীতে সেই একই মামলা আবার যুগ্ম জেলা জজ আদালতে নেওয়া হলে গৌরী বসতভিটা ও কৃষিজমিতে অধিকার পাবেন এই মর্মে রায় হয় ২০০৪ সালে। সেই রায়ের বিরুদ্ধে গৌরীর মৃত বিবাহিত অংশীদারের বড় ভাই জ্যোতিন্দ্রনাথ মণ্ডল ২০০৪ সালে হাইকোর্টে রিভিশন আবেদন করেন। শেষমেশ ২০২০ সালে ১৯৩৭ সালের হিন্দু উইমেন্স রাইটস টু প্রোপার্টি অ্যাক্টের ৩ (১) নম্বর ধারা অনুসারে বিধবা গৌরী তার বিবাহিত অংশীদারের কৃষি-অকৃষি উভয় জমিতেই অধিকার পাবেন এই মর্মে রায় হয়। এখন কথা হচ্ছে, ক'জন নারীর ৩৭ বছর ধরে মামলা টেনে নিয়ে যাওয়ার মানসিক শারীরিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য আছে? ক'জন নারী ন্যায়বিচার পাওয়ার অপেক্ষায় ৩৭ বছরই-বা বেঁচে থাকেন? যদি-বা বেঁচে থাকেনও, ৩৭ বছর পর বৃদ্ধ বয়সে সেই সম্পত্তি দিয়েই-বা সেই নারীর করণীয় কী? নিজের ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্য ৩৭ বছরের অনন্ত আয়ুক্ষয়কারী যুদ্ধ কি ঐ সম্পত্তির বর্তমান বাজারমূল্য দিয়ে কোনভাবে পরিশোধযোগ্য? কেন এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হবে না– সকল ধর্মের, সকল বৈবাহিক অবস্থার, সকল জাতিসত্তার, সকল ধর্মের নারীর অধিকার রক্ষার্থে কোন সামগ্রিক আইন নাই বাংলাদেশে? কেন মুসলমান নারীকে বাবার মাধ্যমে 'হেবা' পাওয়ার সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করতে হবে? ছেলেদের কি সেই সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করতে হয়? পুরুষেরা কি ঈশ্বর আল্লাহ ভগবান বা প্রকৃতি সূত্রে দুই পায়ের মাঝখানে একখানি পুংকেশরের অধিকারী হওয়ার কারণে মাটির পৃথিবীতে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হয়ে যাবেন? সনাতনী সংখ্যাগুরু হয়েও ভারতে হিন্দু সাকসেশান অ্যাক্ট, ১৯৫৬ (২০০৫-এ সংশোধিত) এবং ইন্ডিয়ান সাকসেশান অ্যাক্ট, ১৯২৫-এর মাধ্যমে ভারত রাষ্ট্রের সকল

সনাতনী, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রিশ্চান, পার্সি ও ইহুদি নারীরা তাদের বাবা ও বিবাহিত অংশীদারদের সমান সম্পত্তির অধিকার পান। এছাড়াও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্র তিউনিশিয়া, মিশর ও তুর্কিয়েতে নারীরা কিছু ক্ষেত্রে সিভিল কোডের মাধ্যমে, কিছু ক্ষেত্রে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে পুরুষের সমান সম্পত্তির উত্তরাধিকার হোন। বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হয়েও, সংবিধানের মাধ্যমে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণের কথা বললেও কী কারণে, কোন যুক্তিতে প্রাগৈতিহাসিক ধর্মের নিয়মে আটকা পড়ে থাকবে?

না। এক্ষেত্রে ধর্মই একমাত্র বাধা না। নারীকে অধিকার বঞ্চিত করার পরিক্রমায় আমাদের অঞ্চলে কুসংস্কার আর সিউডো সায়েন্স রসিকতারও তো কম জন্ম নেয়নি আমাদের প্রাণপ্রিয় লৈঙ্গিক আধিপত্যবাদ এবং তার ওপর নির্ভরশীল উদ্বৃত্ত সম্পদ নির্ভর অর্থনীতি মারফত। বিবাহিত নারী তার বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলে সংসারে অভাব নেমে আসা থেকে শুরু করে নারীর কাছে সম্পত্তি সূত্রে ক্ষমতা আসার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীতে বিবাহবিচ্ছেদের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে অবৈধ সন্তানের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হওয়া ক্রন্দনরোলে মেডিক্যাল কলেজের আঙিনা ভরে ওঠার প্রক্রিয়ায় বাবা-মাহীন অনাথ সন্তানদের মানসিক নির্যাতনের সরল সামাজিক সমীকরণে আমরা কত যুগ ধরে নারীকে বঞ্চিত করে আসছি, তার হিসাব করা প্রয়োজন। কত নারী বিবাদে জড়াবেন না, নিজের গায়ে 'ছোটলোক' 'লোভী' 'নারীবাদী' তকমা লাগবে এই ভয়ে ভাইদের অভিশাপ গায়ে লাগবে এই আশঙ্কায় নিজেদের প্রাপ্য অংশ ভাইদের ছেড়ে দেন, উত্তরাধিকার সম্পত্তির বদলে নামেমাত্র একটা ধরিয়ে দেওয়া অঙ্ক নিয়ে, সবচাইতে পেছনের, সবচাইতে 'খারাপ' জমিটা নিচুমুখে হজম করে ফেলেন– তারও একটা হিসাব প্রয়োজন।

১৯০১ সালের আদমশুমারিতেই যেখানে আমরা দেখি কলকাতায় ৭২৫ জন নারী শিক্ষকতা, জনপ্রশাসন, চিকিৎসা সেবা, আলোকচিত্র ধারণের পেশায় যুক্ত আর আজকের ২০২৪ সালের পৃথিবীতে নারী যেখানে পুরুষের পাশাপাশি প্রতিদিন চাঁদে যাচ্ছেন মঙ্গলগ্রহে যাচ্ছেন সমুদ্রের তলদেশে যাচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার বিজ্ঞানী দেশের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, নোবেল পুরস্কার নিয়ে এসে খনিতে শ্রমিকের কাজ করে রাস্তায় ইট ভেঙে পুরুষের পাশাপাশি সৌন্দর্য প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে যুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানে বিপ্লবে পুরুষের সমান রক্ত দিয়ে মরে যাচ্ছেন, সেখানে তারা কেন পুরুষের সমান সম্পত্তি পাবেন না– এই মর্মে আমাদের আলোচনা জারি রাখা প্রয়োজন। নারী-পুরুষের সমতা বলতেই যে কুতর্কের বিদ্যাহীন অসার মস্তিষ্কের দোকান বসে যায়, তার অবসানও প্রয়োজন। সমতা শব্দ যে নারী-পুরুষের শারীরিক-মানসিক পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করে না বরং নারী-পুরুষের পার্থক্যসহই তাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমতার কথা বলে, সে কথাও আমাদের বারবার মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় উপমহাদেশের নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে এ্যানি বেসান্তের বিস্তৃত কাজ আছে। তিনি দেখিয়েছেন লিঙ্গ বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে নারীদের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বঞ্চিতই করা হয় না বরং বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোয় নারী নির্যাতনের রাস্তাকেও প্রশস্ত করা হয়। অমর্ত্য সেনও এই বিষয়ে একই কথা বলছেন। জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি ইন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (১৯৯৫) শীর্ষক প্রতিবেদনে সেন দেখিয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত নারী কীভাবে নিজের ওপর নিজের কর্তৃত্ব হারান। তিনি বলেন সামাজিক ন্যায়বিচারের মৌলিক অর্থাৎ আবশ্যিক অনুষঙ্গ হচ্ছে লৈঙ্গিক

সমতা এবং সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার সেই সমতার প্রাথমিক ধাপ। সুতরাং আমাদের সমাজের হর্তাকর্তা নীতিনির্ধারক বুদ্ধিজীবী হোমড়াচোমড়া যারা ন্যায়বিচারের কথা বলে মুখে ফেনা তুলে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন দিনে তিন বেলা, যারা সমাজ সংস্কার বিষয়ে বড় বড় বাণী দিয়ে পত্রিকার পাতা ফেইসবুক ফিড ভরিয়ে ফেলছেন, যারা সমাজের নিপীড়িতের মজলুমের প্রলেতারিয়াতের দুঃখে-কষ্টে-দুর্দশায় বুক থাবড়ে হায় হায় করছেন তারা কী যুক্তিতে আজকের দিনে বোনদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার, নিজেদের কন্যাদের অধিকার বঞ্চিত করার, নিজেদের রাষ্ট্রের শিক্ষা বঞ্চিত নারীদের আরও অধিকার বঞ্চিত করার পথ প্রশস্ত হতে দেওয়া থামাচ্ছেন না? ভুলে গেলে চলবে না, এই পৃথিবী পুরুষের একলার তৈরি পৃথিবী না। ভুলে গেলে চলবে না, যৌনাঙ্গভিত্তিক দায়িত্বের পৃথিবী থেকে আমরা বের হয়ে এসেছি অনেক যুগ আগে। সুতরাং যেই পৃথিবীতে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি অর্থনৈতিক দায়িত্ব কাঁধে পিঠে কোমড়ে কাঁখে নিতে হয়, যেই পৃথিবীতে নারীকে গৃহবন্দী করে তাকে শুধুমাত্র স্বামী নামক প্রভুর একান্ত যৌনবস্তু ভোগ্যপণ্য হিসাবে, কুলবধূ আর বেশ্যা আর বাঈজী হিসাবে কালীঘাটের পটে গণিমতের মালে মনোরঞ্জনের সামগ্রী আর পরিবারের কাপড় কাচা ভাত রাঁধার সন্তান পালনের চাকর হিসাবে ব্যবহার করা আর সম্ভব না, সেই পৃথিবীতে নারীকে সম্পত্তি বঞ্চিত করা হবে কোন যুক্তিতে? একমাত্র দু'পায়ের মাঝখানে একখানি সবেধন নীলমণি সোনামণি পরাগদণ্ড এবং সেই পরাগদণ্ড মারফত রাস্তায় দাঁড়িয়ে যত্রতত্র মূত্রত্যাগের ক্ষমতার অভাব ছাড়া কোথায়, কোন ক্ষেত্রে, কোন শিল্পে, কোন সাহিত্যে বিজ্ঞানে চিন্তায় আবিষ্কারে নারীর ক্ষমতার অভাব? সুতরাং গত প্রায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ঐতিহাসিক নিপীড়নের মাধ্যমে নারীকে, নারীর যৌনাঙ্গকে, সেই যৌনাঙ্গের উৎপাদনের আশ্চর্য জাদুকরী ক্ষমতাকে নিজেদের সম্পত্তি বানিয়ে বাক্সবন্দী গৃহবন্দী করার প্রয়াসে তাদের কম খেতে দিয়ে, কম খেলতে দিয়ে, কম পড়তে দিয়ে, কম বুঝতে দিয়ে পদ্ধতিগতভাবে তাদের শারীরিক-মানসিকভাবে দুর্বল বানিয়ে তাদের প্রাপ্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করে অর্থনৈতিকভাবে তাদের পঙ্গু বানানোর প্রক্রিয়া কেন আজকের যুগে বলবৎ থাকবে?

সেই অসহযোগের রাস্তা অতি অবশ্যই নারীদের কাম্য না। তারা অসীম মমতায় এতদিন তাদের নির্যাতন করা সন্তানের মুখে ভাত তুলে দিয়েছেন, সম্পত্তি বঞ্চিত করা বাবার মাথায় ভালোবাসার হাত রেখেছেন, তারা নিজেদের নির্যাতকের প্রতি প্রেমে নিজের অসীম শক্তির কথা ভুলে গেছেন বারবার।

কিন্তু নারীর মমতা তার দুর্বলতা না।

অথচ অবাক হতে হয় এই ভেবে যে কোন-এক সময়ে, এই কিছুদিন আগেই– ইতিহাস-পূর্ব ইতিহাসের সময়ে– আর্য অনুপ্রবেশের আগে গোটা উপমহাদেশই মাতৃতান্ত্রিক ছিল। এরপর প্রাক-সামন্তবাদী সময় থেকে ক্রমে মনুবাদী রাজনীতির মারফত নারীকে ভূমির সাথে সম্পর্কিত

উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে চ্যুত করে পুরুষের আধিপত্য তৈরি করা হল। অবশ্য তা একই সঙ্গে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতায়নের ভেতরেই তৈরি হয়েছে। মাথায় রাখা প্রয়োজন, বঙ্গ একই সঙ্গে যেমন 'ম্লেচ্ছ', 'ছোটলোক', 'অনার্য' ভূমিমানুষের ভূমি, তেমনই এ সকল 'শিশু' আধিপত্যবাদের জন্মের লগ্ন থেকে তার কৈশোরেও সেই সমাজ মূলত নারী নেতৃত্বাধীনই ছিল। পরে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ-রাজনীতির বিনির্মাণে বঙ্গে লৈঙ্গিক পুরুষের আধিপত্য তৈরি হলেও তাকে মোকাবেলা করা হয়েছে সমানে সমানে। এবং তা দার্শনিক জায়গা থেকেও। কপিল মুনির সাংখ্য দর্শন থেকে শ্রীচৈতন্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বে পুরুষোত্তমের ধারণা বিকল্পে পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতাদ্বৈত যুগলের ভাব সামনে এসেছে আমরা দেখেছি। এবং তারও বহু আগে আদি তন্ত্রে নারীর স্থান পুরুষের পাশাপাশিই বা কিছু ক্ষেত্রে উপরেও ছিল। তন্ত্রের মূল ধারা মূলত প্রকৃতিবাদী– সেই অর্থে। পরে আবার ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তন্ত্রকেও বিকৃত করে নারী নিপীড়নের নয়া রাস্তা বের করেছেন স্বভাবসুলভ। বঙ্গে নৈঋতি কালী তারা লক্ষ্মী– এই দেবী সকলেই ছিলেন শূন্য প্রকৃতি ও শস্যের মেটাফোর, টোটেম। এমনকি শিবও এখানে এককভাবে পরিপূর্ণ নন, পার্বতী ছাড়া শিব কিছুই না। সুতরাং অবৈদিক সনাতন ধর্মে বলেন, কিংবা বৌদ্ধ ধর্মে– প্রাক-পুঁজিবাদী এই অঞ্চলে আমরা সর্বত্রই নারীশক্তির জয়জয়কার দেখেছি। দেখেছি নারীই উৎসমুখ। কিন্তু মূল সমস্যা শুরু হয় ঔপনিবেশিক আমলে। যখন একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান ঘটানো হচ্ছে, অন্যদিকে সামনে আনা হচ্ছে কট্টরবাদী ওয়াহাবি-সালাফি ইসলামকে, শুরু হচ্ছে সনাতনী-মুসলিম বাইনারি নির্ভর জাতিবাদী রাজনীতির রূপরেখা প্রণয়ন, শুরু হচ্ছে পুরুষের ক্ষমতায়নকে পূর্ণতা দেওয়ার প্রক্রিয়া। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, ব্রিটিশ আমলেও ছোটলোক বা অভদ্রবিত্তের মধ্যেও জাতপাত ও পিতৃতন্ত্রের তেমন প্রভাব ছিল না যতটা ছিল ফিউডাল লর্ডদের ভেতরে। ক্রমে সেই সংস্কৃতিই তথাকথিত 'নিচু'তলায় প্রবাহিত হয়।

পিতৃতন্ত্র বিকশিত হয় পূর্ণভাবে।

এখন সময় এসেছে সেই আধিপত্যের বয়ান, সেই আধিপত্যের রাজনীতি পাল্টানোর।

হ্যাঁ, নারীকে কোনদিন তার প্রাপ্য অধিকার রূপার থলিতে আঙুর ডালিম ময়ূরের পাখা সাজিয়ে পরিবেশন করা হয়নি। নারীকে নিজেই তার অধিকার আদায় করে নিতে হয়েছে যুগে যুগে। আর এবারও জিভ কেটে দেওয়া খনার উত্তরসুরীরা, সারা পৃথিবীতে ডাইনি আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে মারা সব শক্তিশালী ক্ষমতাধর নারীদের উত্তরসুরীরা, সম্পত্তিতে পুরুষের পাশাপাশি নিজেদের সম-অধিকারও আদায় করে নিবেন– তারা পুরুষ-ড্যাডির কেন্দ্রিয় পুরুষ-মস্তিষ্কের কোলে বসে মিঁউমিঁউ করা ললিপপ চোষা পিতৃতন্ত্রের ধারক বাহক কর্ণধার লিঙ্গধার নারী না, তারা নব্যকালের নয়া নারীবাদী, তারা বেশ্যা উপাধিপ্রাপ্ত হয়েও সব সৎগ্রন্থ মাড়িয়ে সব নীতিবাগীশ বক্তাদের দিয়ে নিজেদের নীতিমালা গিলিয়ে 'ব্যভিচার সংগঠনের আশঙ্কা'-র কুৎসিত গপ্পো ছাপানো পত্রিকা অফিসে আগুন দিয়ে খাদ্য-খাদকের সম্পর্কের নতুন সংজ্ঞা উৎপাদন করে নিজেদের অধিকার আদায়কল্পে নিজেদের যৌনাঙ্গে তালা দিয়ে সন্তান জন্মদান বন্ধ করে দেওয়া অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দিতে সক্ষম। সেই অসহযোগের রাস্তা অতি অবশ্যই নারীদের কাম্য না। তারা অসীম মমতায় এতদিন তাদের নির্যাতন করা সন্তানের মুখে ভাত তুলে দিয়েছেন, সম্পত্তি বঞ্চিত করা

বাবার মাথায় ভালোবাসার হাত রেখেছেন, তারা নিজেদের নির্যাতকের প্রতি প্রেমে নিজের অসীম শক্তির কথা ভুলে গেছেন বারবার।

কিন্তু নারীর মমতা তার দুর্বলতা না।

নারীর মমতা তার প্রজ্ঞা। নারী জানেন তিনিই প্রকৃতি। তিনি জানেন প্রকৃতিকে পুরুষের চাইতে প্রাজ্ঞ হতে হয়।

তবে সেই একই প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী রূপও, সেই সব পুরুষাধিপত্যের অহংকার ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া সুনামিও আমরা দেখেছি।

প্রয়োজন হলে সেই ঝড়বন্যাজলোচ্ছ্বাসসুনামি আবার দেখবো আমরা।

লেখক: গবেষক

সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকার: নারীকে রাজনৈতিক জীব হিসাবে স্বীকৃতির প্রাথমিক পদক্ষেপ

পারভেজ আলম

১

সাধারণত বাংলাদেশে নারীদেরকে তাদের ভাইদের সমান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা নিয়ে কথা উঠলেই ইসলাম ধর্মীয় এস্টাবলিশমেন্টের পক্ষ থেকে বিরোধিতামূলক হুঙ্কার শোনা যায়। মনে হয় যে নারীদের সম্পত্তিতে সমান অধিকার নিয়ে আলাপ তোলাটা খুব ইসলাম বিরোধী একটা কাজ। ইসলামপন্থীরা কোরান-হাদিসে হাজির থাকা সুস্পষ্ট বিধানের কথা বলে পিতার সম্পত্তিতে নারীদের সমান অধিকারের বিরোধিতা করেন। তাদের দাবি, সুস্পষ্ট বিধান আছে কোরান-হাদিসে এমন কিছুর বিরুদ্ধে কোন আইন হলে তা ইসলাম বিরোধী কাজ হবে। আবার ধর্মকেই সকল সমস্যার মূল মনে করা অনেক সেক্যুলারিস্টও হয়তো এই ইসলামপন্থীদের সাথে একমত হয়ে বলবেন যে, ইসলাম মৌলিকভাবেই একটা পিতৃতান্ত্রিক ধর্ম। এবং যেহেতু এই ধর্মের সুস্পষ্ট বিধানগুলার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন সম্ভব না, সেহেতু ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে কখনোই পিতার সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার আদায় করা সম্ভব না। কিন্তু আসলে 'ইসলাম' নামক কোন কিছুর দায়ভার এক্ষেত্রে কমই।

আইনী দিক থেকে দেখলে বাংলাদেশে হিন্দু নারীদের সম্পত্তির উপর অধিকার মুসলিম নারীদের তুলনায় কম। ইসলামে অন্তত নারীদেরকে সম্পত্তির অধিকারসম্পন্ন সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু হিন্দু আইনে নারীরা এখনও সম্পত্তির অধিকারসম্পন্ন মানুষ নন। বরং তারা নিজেরাই সম্পত্তি। বাংলাদেশের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ সব সময়ই সেক্যুলার আইনের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হিসাবে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার বিরোধিতা করেছে। তবে নারীদেরকে সম্পত্তির অধিকারহীন এবং সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করার এই ঐতিহ্য আসলে হিন্দু অথবা মুসলিম ঐতিহ্য নয়। এমনকি আসলে ঠিক ধর্মীয় ঐতিহ্যও নয়। বরং একটি প্রাচীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থারই লিগ্যাসি বহন করে নারী বিষয়ক এ ধরনের চিন্তা। প্রাচীনকালের যে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে পিতৃতন্ত্রের উন্মেষ ঘটেছিল, আধুনিককালে বিভিন্ন

ধর্মের প্রতিনিধি ও পুরোহিতরা ধর্মের কোন সুস্পষ্ট বিধানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে পরিবর্তনের বিরোধিতা করবেন, আর কোন সুস্পষ্ট বিধান বেমালুম ভুলে যাবেন, তা নির্ভর করছে 'ডিসকার্সিভ ট্রাডিশন' হিসাবে বর্তমানকালে ধর্মগুলার পুঁজিবাদ নির্ভরতার উপর। যেমন ধরেন যে, কোরান-হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় সুদ ও পুঞ্জীভবনের বিরোধিতা করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক সুদ ও উদ্বৃত্তমূল্য নির্ভর অর্থ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদেরকে তৎপর হতে দেখা যায় না। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা যে ইসলামপন্থীরা শুধু গ্রহণই করেছে তা না বরং এই অর্থ ব্যবস্থাকে ইসলামসম্মত করারও চেষ্টা করেছে। সুদ নির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি তারা যেমন সহনশীল, তেমনি ইসলামী ব্যাংক নামক 'বিদাত' তৈরিতেও তারা পিছপা হয় নাই। আধুনিক ইসলামিক স্টাডিজের বড় অংশই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার নামে পুঁজিবাদের ইসলামীকরণের যজ্ঞ সম্পাদন করে চলেছে। নারীর সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আলোচনা সেই তুলনায় যৎসামান্য।

> **"**
>
> **তবে নারীদেরকে সম্পত্তির অধিকারহীন এবং সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করার এই ঐতিহ্য আসলে হিন্দু অথবা মুসলিম ঐতিহ্য নয়। এমনকি আসলে ঠিক ধর্মীয় ঐতিহ্যও নয়। বরং একটি প্রাচীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থারই লিগ্যাসি বহন করে নারী বিষয়ক এ ধরনের চিন্তা। প্রাচীনকালের যে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে পিতৃতন্ত্রের উন্মেষ ঘটেছিল, আধুনিককালে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি ও পুরোহিতরা ধর্মের কোন সুস্পষ্ট বিধানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে পরিবর্তনের বিরোধিতা করবেন, আর কোন সুস্পষ্ট বিধান বেমালুম ভুলে যাবেন, তা নির্ভর করছে 'ডিসকার্সিভ ট্রাডিশন' হিসাবে বর্তমানকালে ধর্মগুলার পুঁজিবাদ নির্ভরতার উপর।**

উত্তরাধিকার আইন বিষয়ে কোন আলাপ উঠলেই তার বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদের হুঙ্কার থেকে আসলে আমরা ইসলাম সম্বন্ধে তেমন কোন সত্য জানতে পারি না। তবে যা বুঝতে পারি তা হল যে, পিতৃতন্ত্র কেবল একটি প্রাচীন মতাদর্শ ও শাসনতন্ত্রই নয়। বরং আধুনিকতা এবং পুঁজিবাদও পিতৃতন্ত্রের সাথে হাত ধরাধরি করে চলতে পারে। সৌদি আরব এই বাস্তবতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইউরোপেও আধুনিকতা ও পুঁজিবাদ বিকাশের অনেক পরে নারীরা ভোটের অধিকার পেয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশেও পুঁজিবাদ আরও বিকশিত হতে ও টিকে থাকতে পারবে পিতৃতন্ত্রের সাথে হাত ধরাধরি করেই। এক্ষেত্রে তথাকথিত আলেম সমাজ এবং ইসলামপন্থীদের ভূমিকা মূলত পিতৃতান্ত্রিক পুঁজিবাদী একটা সমাজকে ধর্মসম্মতি দেওয়া। অন্তত এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি এমনই।

২

আমি গ্রিকদের সোফিয়া,
এবং অগ্রিকদের মাশুক।

গ্রিকদের কাছে আমি বিচার; অগ্রিকদের কাছেও।
মিশরে আমার ছবির অভাব নাই,
অগ্রিকদের কাছে আমি 'সে'; যার কোন ছবি নাই।
...
আমি সম্মানিত, এবং ঘৃণিত,
আমি বেশ্যা, এবং পবিত্র।
আমি স্ত্রী, এবং কুমারী
আমি মা, এবং কন্যা।
...
আমি অবোধ্য নীরবতাঃ
এবং চিন্তন, মহান যার স্মরণ।
আমি সেই কণ্ঠ, যার ধ্বনিরা অগণ্য
এবং সেই কথা, যার ছবিরা অসংখ্য।
আমিই সে, যে বুলিঃ আমার নিজেরই নামের।
...
আমি সেই শ্রবণ, যিনি সদাই গ্রাহ্য;
আমি সেই বয়ান, যাকে থামানো যায় না।
আমি ধ্বনির নাম, এবং নামের ধ্বনি।
আমিই লেখার অর্থ,
এবং ফারাকের প্রকাশ।

—— থান্ডার, পারফেক্ট ইন্টেলেক্ট (আংশিক অনুবাদ)

গত শতকে আবিষ্কৃত নাগ হাম্মাদি লাইব্রেরিতে পাওয়া একটি প্রাচীন নস্টিক কবিতা হলো থান্ডার, পারফেক্ট ইন্টেলেক্ট। এই কবিতায় সোফিয়া বা প্রজ্ঞাকে এক ধরনের ডিভাইন ফেমিনিন কণ্ঠ হিসাবে এবং প্যারাডক্সিকাল ও বিশুদ্ধ চিন্তারূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এইরকম আরও কয়েকটা নস্টিক টেক্সট আছে যাতে বিবি হাওয়া, জীবের জীবন (জোয়ি), নুহ নবীর স্ত্রী নোরেয়া ইত্যাদি রূপকে খোদার কণ্ঠকে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এই কণ্ঠ নিয়ে তত্ত্বচর্চা করা হয়েছে। যেমন, বিবি হাওয়ার সুসমাচার (গসপেল অফ ইভ) নামক কিতাবে সোফিয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে 'বজ্রকণ্ঠ' হিসাবে। আহমদ ছফার 'বোবা বউ'-ও সোফিয়ার এই ধরনের উপস্থাপন। অথবা বলা যায় যে, বোবা বউ ছফার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন আমাদের কাছে। ছফা 'ওঙ্কার' লেখার সময় বারবেলো (Barbelo) হয়ে ওঠেছিলেন বা রাধাভাব অর্জন করেছিলেন বলেই হয়তো তা সম্ভব হয়েছিল।

৩

পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ কেবল ধর্মের উপর নির্ভর করে টিকে থাকে না। বরং মানুষের প্রাত্যহিক ভাষা এবং সংস্কৃতির জগতে এর উপস্থিতি ও কর্মপ্রক্রিয়াকে না বুঝলে নিখাদ ধর্মীয় আইন বিরোধিতা একটি অর্থহীন সংগ্রামে পরিণত হবে। বা বড়জোর একটি লিবারাল মূল্যবোধ নির্ভর রাজনৈতিক তৎপরতায় পর্যবসিত হবে। দশকের পর দশক বাংলা সিনেমায় ধর্ষণের ঘটনাকে 'ইজ্জত নষ্ট'

অথবা 'ইজ্জত লুট' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্ষণ যে একটা শারীরিক হামলা বা সহিংসতা এবং মানুষের মানবিক মর্যাদার অধিকার হরণের ঘটনা– ইজ্জত নষ্টের ধারণার মধ্যে তা প্রকাশ পায় না। বরং ইজ্জত নষ্ট করা অথবা লুটের ধারণা হল সম্পত্তি নষ্ট বা লুটের সাথে যুক্ত ধারণা। সহিংসতা ও মানবিক মর্যাদা হরণ এক ধরনের অপরাধ, আর প্রোপার্টি ড্যামেজ বা লুট হল আরেক ধরনের অপরাধ। অর্থাৎ আমাদের সমাজে ধর্ষণকে সহিংসতা বা ডিগনিটি অবমাননার অপরাধ হিসাবে না বরং প্রাচীনকালের মতো প্রোপার্টি ড্যামেজ বা লুটের অপরাধ বলে এখনও গণ্য করার চল দেখা যায়।

ইজ্জত কী জিনিস? সেই প্রশ্নে যাওয়ার আগে বোঝা দরকার কার ইজ্জত? ভিক্টিমের? তা মনে হয় না। কারণ ধর্ষণকে ইজ্জত নষ্ট বা লুট হওয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করাটা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য, পুরুষের আবিষ্কার। নারীকে এখানে দেখা হচ্ছে পিতা, ভ্রাতা অথবা স্বামীর সম্পত্তি হিসাবে। ফলে সেই সম্পত্তি নষ্ট বা লুট হওয়ার ধারণা চলে আসছে। আর ইজ্জত বা সম্মানের ধারণা যে একটা অর্থনৈতিক ধারণা তা আজকাল নৃতাত্ত্বিকরা দাবি করে থাকেন। অর্থ বা টাকার ধারণার উৎসও পাওয়া যায় সম্মানের ধারণার মধ্যে। ইজ্জত বা সম্মান সংক্রান্ত আলোচনা তাই মূলত ইকোনোমিক ট্রানজেকশন সংক্রান্ত আলোচনা। আমাদের সমাজে এই বাস্তবতাটা খুব ভালোভাবে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে ধর্ষিতার পরিবারকে টাকা দিয়ে মীমাংসা করার ঐতিহ্যের মধ্যে। ধর্ষিতার বিষয়ে পুরুষদের বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমেও বিষয়টা আরও ভালোভাবে বোঝা যায়। বিভিন্ন ধর্ষণের ঘটনার পর অনেক পুরুষের মধ্যে যে ভিকটিম ব্লেমিংয়ের প্রবণতা দেখা যায় বা যে ভাষায় তারা প্রতিক্রিয়া জানায়, তা খেয়াল করলে দেখা যায় যে ভিক্টিম একজন সম্মানিত নারী কি না সেই প্রশ্নটির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পতিতা, মিডিয়াকর্মী, সিনেমার নায়িকা থেকে শুরু করে গার্মেন্টসের শ্রমিক, এহেন নানান পরিচয়ের নারীদের সম্মানিত নারী বলে মনে করা হচ্ছে না। রাত নয়টার পরে বার্থডে পার্টিতে থাকা পার্টিগার্লদের সম্মান একজন তথাকথিত আদর্শ মা, বোন, স্ত্রীদের সম্মানের সমান নয় বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। আর যার সম্মান বা ইজ্জত কম অথবা একেবারেই নাই, তার সম্মান বা ইজ্জত লুট হওয়াটা গুরুতর অপরাধ বলে মনে করা হচ্ছে না। অথবা তাদেরকে পাবলিক প্রোপার্টি বিবেচনা করে প্রোপার্টি ড্যামেজ বা লুট হয় নাই বলে মনে করা হচ্ছে।

একজন প্রগতিশীল পুরুষ যদি নারীদের পোশাক ও চলাফেরার স্বাধীনতা নিয়ে তর্ক করতে যায়, তখন সাধারণত তাকে এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় যে সে তার মা, বোন, স্ত্রীকে তেমন পোশাক পরতে দেবেন কি না। অথবা রাত নয়টার পর পার্টিতে যেতে দেবেন কি না। আর কোন প্রগতিশীল নারী একই বিষয়ে তর্ক করতে গেলে সরাসরি খানকি (ধর্ষণযোগ্য) ট্যাগও খেয়ে যেতে পারেন। অবশ্য আজকাল ধর্ষণের বিরুদ্ধে ফেসবুকে যারা প্রতিবাদ করছেন, সেই পুরুষদের একটা বড় অংশও ধর্ষণকে ইজ্জত বা সম্মানের ধারণার বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে পারেন বলে মনে হয় না। তাদের প্রতিবাদের ভাষা ও ধরনের মধ্য দিয়ে তা বোঝা যায়। ধর্ষণ বড় অপরাধ, তবে হত্যাকাণ্ডের চাইতে বড় নয়। এমনকি তনু হত্যাকাণ্ডের পরেও দেখা গেছে যে মানুষের মধ্যে তার হত্যার চাইতে সম্ভাব্য ধর্ষণের বিরুদ্ধেই আউটরেজটা বেশি ছিল। আমার মনে হয় এই ধরনের আউটরেজ আমাদের সমাজের কালেক্টিভ পুরুষালি ইজ্জতের সাথে যুক্ত।

আধুনিক দুনিয়া চলে মর্যাদা তথা মানবিক মর্যাদার ধারণার উপর ভিত্তি করে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'হিউম্যান ডিগনিটি'। তবে ধারণাটি অনেক পুরাতন। খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম এই ধারণাটির

বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। ইসলামে মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত, সকল প্রাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণ। এই ক্ষেত্রে নারী পুরুষে ভেদাভেদ নাই। কোরান শরীফে আছে আল্লাহ আদম সন্তানকে সকল প্রাণের উপর মর্যাদা দান করেছেন। মর্যাদার ধারণা মানুষ হওয়ার সাথে যুক্ত, নারী অথবা পুরুষ হওয়ার সাথে না। বাইবেল, কোরান থেকে যে মর্যাদার ধারণার সূত্রপাত, ফরাসি বিপ্লব এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কনভেনশনের পথ ধরে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও দেশের সকল মানুষের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ধারণাটি যুক্ত হয়েছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জনতার সংগ্রামে যেমন মানবিক মর্যাদার ধারণা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি জুলাই বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশেও মানবিক মর্যাদা হল অন্যতম মূল্যবোধ যার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্র মেরামতের তৎপরতা জারি আছে। বাংলাদেশের সকল মানুষের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রাম সহজ হবে না। কেননা আমাদের সমাজে ইজ্জত বা সম্মানের প্রাচীন ধারণাটি এখনও অত্যন্ত শক্তিশালী।

নৃতাত্ত্বিক ডেভিড গ্র্যাবার যথার্থই বলেছেন যে, সম্মান হল উদ্বৃত্ত মর্যাদা (Surplus Dignity)। অর্থাৎ অপরের মর্যাদা কেড়ে নিয়ে যারা ক্ষমতাবান হয়, সম্মান জিনিসটা তাদের। বাংলাদেশে ক্ষমতাবান মানুষের সংখ্যা খুব বেশি না। কিন্তু এই দেশের সকল পুরুষই নারীর মর্যাদা কেড়ে নিয়ে নিজেদেরকে সম্মানিত করে রেখেছে। নারীর মর্যাদার বিনিময়ে যে উদ্বৃত্ত মর্যাদা বা সম্মান সে লাভ করেছে, তা ছাড়তে তো সে চায় না। হোক সে হিন্দু বা মুসলমান। বাংলাদেশে শরীয়া আইনের পক্ষে গলা ফাটানো পুরুষ পাওয়া যাবে অনেক, কিন্তু শরীয়া আইন অনুসারে নিজের বোনকে প্রাপ্য সম্পত্তি বুঝিয়ে দেওয়ার মতো ভাইয়ের সংখ্যা এখনও কম। এই বাস্তবতার দিকে চোখ রাখলেই আমরা বুঝতে পারবো যে বাংলাদেশের সমাজে নারীদের সম্পত্তিহীনতা ও আত্মমালিকানাহীনতা (ডিসপসেজড) অবস্থার পেছনে ইসলামের দায় কমই। বরং এ হল ইসলামের আবির্ভাবেরও বহু আগে থেকে চলে আসা আর্থ-সামাজিক বাস্তবতারই ধারাবাহিকতা।

৪

"গত পাঁচ হাজার বছরে অন্তত দুইবার নৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ও নাটকীয় ধরনের উদ্ভাবনের সূচনা ঘটেছে সেই অঞ্চলে যাকে আমরা এখন ইরাক বলি। প্রথম উদ্ভাবনটা ছিল সুদযুক্ত ঋণের, খুব সম্ভবত তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে। দ্বিতীয়টি সংঘটিত হয়েছে আট'শ খ্রিস্টাব্দের দিকে, যখন প্রথম এমন একটি কার্যকর বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল যা একে (সুদ) সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়েছিল। এটা কি সম্ভব যে নতুন কোন উদ্ভাবনের সময় হাজির হয়ে গেছে?... এটা সত্যি যে ইসলামী অর্থনীতি নামে সাম্প্রতিক সময়ে যা হাজির হয়েছে তা নিশ্চিতভাবেই মুগ্ধ হওয়ার মতো কিছু নয়। নিঃসন্দেহে, কোনভাবেই তা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠতে পারে না।... অথবা, হয়তো পুরাতন পিতৃতন্ত্রের শুদ্ধতাবাদী কোন উত্তরাধিকারের কাছে তেমন কোন যুগান্তকারী সাফল্য আর আশা করাই ঠিক না। কে জানে, হয়তো চ্যালেঞ্জটা আসবে নারীবাদের কাছ থেকে। অথবা ইসলামী নারীবাদের কাছ থেকে। অথবা হয়তো একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত কোন পক্ষ থেকে। কে জানে? শুধু একটা বিষয়ই নিশ্চিতভাবে দাবি করা যায়, আর তা হল যে ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে নাই এবং চমকপ্রদ নতুন চিন্তার আবির্ভাব ঘটবেই।"

—— ডেভিড গ্র্যাবার, ডেবট; দা ফার্স্ট ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার্স

খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার সালের দিকের যে সময়ের কথা গ্র্যাবার বলছেন তা মূলত প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় ব্যাবিলনেরও উত্থানের আগের সময়কার কথা, যখন সেখানে উরুক নগরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর আট'শ খ্রিস্টাব্দ বলতে তিনি সেই সময়টিকে বোঝাচ্ছেন যখন আব্বাসি খেলাফতের অধীনে ক্লাসিকাল সুন্নি ইসলামী আইন ও নৈতিক অবস্থান নির্ভর বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল। ইসলামী নারীবাদের প্রতি কেন গ্র্যাবার আশা রাখতেন তা নিয়ে অবশ্য তিনি বিস্তারিত কিছু লেখেন নাই। তবে অক্ষীয় যুগের যে বিবরণ তিনি হাজির করেছেন তা মাথায় রাখলে হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হয়। এবং সম্মান ও মর্যাদার পার্থক্যের যে নৃতত্ত্ব তিনি হাজির করেছেন, তা-ও মাথায় রাখা দরকার। অক্ষীয় যুগে সার্বভৌম ক্ষমতার হাতে নিজেদের মর্যাদা হারিয়েছিল নারী-পুরুষ সকলেই। সার্বভৌম শাসকরা গণহারে মানুষকে দাস, সৈনিক ও হেরেমের যৌন দাসী বানাতেন তাদের মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে এবং সেই উদ্বৃত্ত মর্যাদা দিয়েই নিজেদেরকে সম্মানিত করতেন। এই প্রেক্ষাপট মাথায় না রাখলে দুনিয়াবী সার্বভৌম ক্ষমতার বাইরে এক খোদার সার্বভৌমত্বের ধারণার বিকাশ এবং সেই এক খোদার অধীন ব্যক্তি আদম তথা মানুষের ধারণার বিকাশের গুরুত্ব বোঝা যাবে না।

কিন্তু ইসলামের যে বেহাত বিপ্লব হওয়ার ইতিহাস, তা একই সাথে নারীদের মর্যাদা পিতৃতন্ত্রের হাতে লুণ্ঠিত হয়ে যাওয়ারও ইতিহাস। নবীর জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে নারীদের যে অবস্থান ছিল, তা তার মৃত্যুর পরই তথাকথিত ইসলামী সমাজ থেকে নাই হয়ে গিয়েছিল। ভুলে গেলে চলবে না যে, এই আন্দোলন যখন সীমাবদ্ধ ছিল হাতে গোনা যায় এমন কয়েকজন মুমিনের মধ্যে, তখনও এই আন্দোলনে দাস ও নারী এক্টিভিস্টদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। আব্বাসিরা পরিচিতি পেয়েছিলেন তাদের পূর্বপুরুষ আব্বাসের নামে, যিনি ছিলেন নবীর চাচা। অথচ বাস্তবে আব্বাসেরও বহু বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তার স্ত্রী লুবাবা। সেই লুবাবা, যিনি হয়তো খাদিজার পরেই প্রথম নারী মুসলমান। সেই লুবাবা, যার মার খেয়ে আবু লাহাব মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আদি ইসলামের ইতিহাস তাই এই আন্দোলনের মধ্যে হাজির থাকা পিতৃতন্ত্র বিরোধিতা ও নারী স্বাধীনতার রুহানি চেতনার সাথে বেইমানি ও তার কবর দেওয়ার ইতিহাসও। ইসলামের মোহাফেজখানা ঘাটলে, এর ডিসকার্সিভ কাঠামো খনন করতে গেলে এই সত্যগুলা খুঁজে পাওয়া যায়। খুঁজে পাওয়া যায় কোরানের মনোযোগী পাঠে। ইসলামে নারীর মানবিক মর্যাদা স্বীকার করা হয়েছে। এবং স্বীকার করা হয়েছে সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার। পিতার অর্ধেক সম্পত্তির আইনটি করা হয়েছিল নারীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য নয় বরং তৎকালীন সমাজে এটাই ছিল সম্পত্তির সুষম বণ্টনের সবচাইতে ভালো একটি পদ্ধতি। তবে সময় পাল্টায়। এক যুগের উৎকৃষ্ট সমাধান আরেক যুগে স্থবির রক্ষণশীলতা ও জুলুমের রূপ ধারণ করতে পারে।

৫

"তুমি ডাট মারিও না– নবী ছিল তোমার হাবিব,
কিন্তু খাদিজার ছিল বেতনে বাধা কর্মচারী।"

—— ফরহাদ মজহার

ইবনে রুশদ তার সময়কার মদিনা তথা নগরগুলার (আপনার সুবিধা হলে রাষ্ট্রও ভাবতে পারেন) নারীদেরকে তুলনা করেছিলেন নগরের গাছগুলার সাথে। এই উপমার ব্যবহার তিনি করেছেন

প্লেটোর রিপাবলিকের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে। ইবনে রুশদের রাজনৈতিক চিন্তা যে কয়টি বইয়ে পাওয়া যায় এর মধ্যে এই বইটি অন্যতম। এই বইয়ে তিনি শুধু প্লেটোর কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণাই ব্যাখ্যা করেন নাই, তার নিজের অনেক চিন্তাও তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে তার নারীবাদী চিন্তাও আছে।

এই গাছের রূপকটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এই রূপকটাকে কেবল অলঙ্কার ভাবা ঠিক বলে মনে করি না। বরং একটা পরিভাষা হিসাবে বোঝা জরুরি মনে করি। কারণ মধ্যযুগের মুসলিম চিন্তকরা সকল জীবকে যে হায়ারার্কির শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে ফেলে বুঝতেন তাতে গাছের জন্য নির্ধারিত একটা জায়গা আছে। তাছাড়া তিনি নারীদের তুলনা করেছেন তার সময়কার মদিনা তথা নগরগুলার গাছের সাথে, জঙ্গলের গাছের সাথে তো নয়। জীবের যেই শ্রেণিবিভাগের কথা বলছি তার একটি ভালো সারমর্ম পাওয়া যায় ইবনে খালদুন রচিত মুকাদ্দিমায়। এই শ্রেণিবিভাগে দেখবেন গাছকে রাখা হয়েছে খনিজ পদার্থ থেকে বিকশিত এবং তার থেকে উচ্চ অবস্থানে। তবে গাছমাত্রই চলতে সক্ষম প্রাণিদের থেকে নিম্ন পর্যায়ের। গাছের পরবর্তী ও উচ্চ পর্যায়ের জীবের মধ্যে একটি পর্যায় হল বানর পর্যায়, যার পরবর্তী ও উচ্চ পর্যায় হল মানুষ। জীবের শ্রেণিবিভাগের এই ঐতিহ্য যদি আপনি মাথায় রাখেন তাহলে নারীদেরকে গাছের সাথে তুলনা করাটা আর নিখাদ আলঙ্কারিক ব্যাপার থাকে না। বরং এর ফলে নারীদের জীবনকে মানুষের জীবন তো বটেই এবং বানর ও অন্যান্য প্রাণির জীবনের চাইতেও নিচু, তাদের চাইতেও কম বিবর্তিত বা বিকশিত একটা জীবের জীবনের অবস্থান দেওয়া হয়। গাছের সাথে তুলনা করার কারণ হিসাবেও ইবনে রুশদ পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন। কারণ এই নগরগুলাতে নারীদেরকে মানুষের গুণাবলি চর্চা করানো হয় না। অর্থাৎ নারীদের গাছে পরিণত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একান্তই মদিনা বা নগর বা রাষ্ট্রের ব্যাপার এবং তাকে মানুষের গুণাবলি চর্চা না করানোর এই চর্চাটাও চূড়ান্ত রকম রাজনৈতিক একটা ব্যাপার। এই ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে এবং ইবনে রুশদের এই উপমার বৈপ্লবিকতা আমাদের জন্য আরও অর্থময় হয়ে ওঠবে যদি আমরা তার বক্তব্যকে আগামবেনের হোমো স্যাকের বইটির আলোকে বোঝার চেষ্টা করি। আগামবেনের মতে, প্রাচীনকাল থেকেই পাশ্চাত্যে নারীর জীবনকে কেবলই জীবের জীবন (গ্রিক: জোয়ি, আরবি: হাওয়া) হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। নাগরিক অধিকারসম্পন্ন রাজনৈতিক জীবন (বায়োস) ছিল কেবলই স্বাধীন পুরুষ লোকের। আধুনিক যুগেও যে এই পরিস্থিতি আমূল পাল্টে গেছে, তা বলার উপায় নাই।

বলে রাখা দরকার যে, ইবনে রুশদ এবং আগামবেন দুজনই তাদের চিন্তা গড়ে তুলেছেন এরিস্টটলের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে। রুশদ যদিও প্লেটোর রিপাবলিকের তফসির লিখেছেন, কিন্তু আদতে তিনি ছিলেন মূলত একজন এরিস্টটল বিশেষজ্ঞ চিন্তক। আগামবেন আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে প্রাচীন গ্রিসের আমল থেকেই (এবং এরিস্টটলের লেখাতেও) পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তায় মানুষের জীবনকে বায়োস তথা রাজনৈতিক/পরীক্ষিত জীবন এবং জোয়ি বা জীবের জীবন হিসাবে ভাগ করার চর্চা চালু আছে। জীবের জীবন হল মূলত ঘরের জীবন যা ক্ষুধা নিবারণ, সন্তান জন্মদান, লালন-পালন ইত্যাদি জৈবিক কার্যাবলিতে সীমাবদ্ধ জীবন। প্রাচীন গ্রিসে ও রোমে নারী ও দাসদের জীবন ছিল কেবলই জীবের জীবন। রাজনৈতিক বা নাগরিক জীবন ছিল শুধু স্বাধীন কিছু পুরুষের যারা নিজ নিজ পরিবারের কর্তা ছিলেন। ইবনে রুশদ লিখেছেন যে তার সময়কার নগরের নারীদেরকে বানানো হয়েছে পুরুষের সেবক এবং তাদের সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে শুধুই

পুনরুৎপাদন ও লালন-পালনের কাজে। তবে এরিস্টটল উদ্ভিদ ধরনের জীবনকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা মাথায় রাখলে ইবনে রুশদের উপমার শক্তিটা আরও ভালো বোঝা যাবে। এরিস্টটলীয় ধারার চিন্তায় উদ্ভিদ ছিল নন-সেন্টিয়েট বিইং, মানে যাদের মধ্যে অন্যান্য জীবের মতো পুনরুৎপাদন এবং বেড়ে ওঠার গুণাবলি থাকলেও আবেগ-অনুভূতি নাই।

> **নগর বা রাষ্ট্র যে জীবদের রাজনৈতিকতা স্বীকার করে না, যে জীবনকে জীবের অধিক আর কোন মর্যাদা দিতে চায় না, তাদেরকে আবার পুরোপুরি নগরের বা রাজনীতির বাইরের বিষয়েও পরিণত করে না। রাজনৈতিক অধিকারহীন এই জীবন রাজনৈতিকভাবেই উৎপাদিত।**

জীবের জীবনকে পাশ্চাত্য চিন্তায় নগরে যেভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে, আগামবেন তাকে ব্যাখ্যা করেছেন ইনক্লুসিভ এক্সক্লুশন অর্থাৎ বহির্ভূত হিসাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ হিসাবে। নগর বা রাষ্ট্র যে জীবদের রাজনৈতিকতা স্বীকার করে না, যে জীবনকে জীবের অধিক আর কোন মর্যাদা দিতে চায় না, তাদেরকে আবার পুরোপুরি নগরের বা রাজনীতির বাইরের বিষয়েও পরিণত করে না। রাজনৈতিক অধিকারহীন এই জীবন রাজনৈতিকভাবেই উৎপাদিত। এই ধরনের জীবনকে রাজনীতিতে বহির্ভূত রাখলেও, নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করে রাখলেও নগরে তাদেরকে ঠিকই অন্তর্ভুক্ত করা হয়– রাজনৈতিকতা বা নাগরিকত্ব বহির্ভূত হিসাবে। জীবের জীবনকে নগর বা মদিনায় বহির্ভূত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে যে জীবন বা অস্তিত্বকে নগর গ্রেফতার করে রাখে তারই অপর নাম 'বেয়ার লাইফ' বা উন্মুক্ত জীবন। তো ইবনে রুশদ যখন লিখেছিলেন যে তার সময়কার মদিনাগুলাতে নারীদের জীবন মদিনার গাছগুলার মতোই, তখন তিনি আসলে মদিনার মধ্যে নারীদেরকে বেয়ার লাইফ হিসাবে গ্রেফতার করে রাখার বাস্তবতাটাই তুলে ধরেছেন। এই ব্যাপারটা মাথায় রাখলেই ইবনে রুশদের উপমার বৈপ্লবিকতা ঠিকভাবে বোঝা যায় বলে মনে করি।

ইবনে রুশদ তার বিভিন্ন লেখালেখিতে দাবি করেছেন যে নারীদের এই অবস্থান সাংস্কৃতিক, জৈবিক নয়। কেননা নারীদের পক্ষে পুরুষের মতোই সকল প্রকার নাগরিক তথা রাজনৈতিক ও সামরিক দায়িত্বও পালন করা সম্ভব। তিনি হাদিস ও ফিকহের মাধ্যমেই তার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। তবে আমাদের কাজ হল ইবনে রুশদের বৈপ্লবিক নারীবাদী অবস্থানকে আরো বিস্তৃত করা। খোদ নবী যে মদিনার জন্ম দিয়েছিলেন তাতেই পরবর্তীতে নারীদেরকে কীভাবে বেয়ার লাইফে পরিণত করা হয়েছিল, সেই ইতিহাস আমাদের তুলে ধরতে হবে। খলিফা ওমরের আমল থেকে মদিনার মসজিদে নারীদের অধিকার সীমিত করা কিংবা খলিফা ওসমান ও আলীর আমলে আয়েশাকে রাজনীতির বাইরে থাকতে এবং ঘরের ভেতরে থাকতে বাধ্য করার যে ইতিহাস তা-ও এই ইতিহাসের অংশ হবে। এই ইতিহাস লেখা সম্ভব হবে না খাদিজাকে বাদ দিয়েও। সেই খাদিজা যিনি কেবল বিশ্বাসীদের মাতা ধরনের কোন পবিত্র সত্তা ছিলেন না। সেই খাদিজা যিনি কিছু ক্ষেত্রে খোদ নবীরও গুরু ছিলেন, যে নবীকে কোলে বসিয়ে তিনি আশ্বস্ত করেছেন তার কাছে জিবরাইল এসেছে, কোন শয়তান না। খাদিজার মতো নারীদের চাইতে ভীতিকর কোন চরিত্র বর্তমান দুনিয়ার ইসলামপন্থীদের কাছে কেউ হতে পারে না।

৬

আদর্শ মানুষ বা ইনসানে কামেলের যে ধারণা, তা হল জীব ও জড় জগতের প্রতিনিধিত্বকারী খলিফা সত্তার ধারণা। এ কারণেই তাকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত বা সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত্তা। এই আদর্শ মানুষ কেবল পুরুষ নয়। বরং এই আদর্শ মানুষের ধারণা নারী ও পুরুষের ঊর্ধ্বে। প্রকৃতি এবং রুহের বাইনারিরও ঊর্ধ্বে। আদর্শ মানুষের ধারণা (আকার) বা ফর্ম বিরাজ করে যেই মোকামে, তা হল সেই পরম নূর বা পরম রুহের (ইসলামী ঐতিহ্যে যার অপর নাম নূর মুহাম্মদ) মোকাম, যার অবস্থান আল্লাহর সবচাইতে নিকটবর্তী। পুরুষ/রুহ ও প্রকৃতি/ম্যাটার– এই দুইয়ের মধ্যকার বাইনারি অতিক্রম করার চর্চা ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যেই রয়েছে। মওলানা রুমি মানবদেহকে তুলনা করেছেন মাতা মরিয়মের সাথে। হোক সেই দেহের আকার জৈবিকভাবে পুরুষ অথবা নারীর। আর মানবদেহ নামক মরিয়মের ঘরে হাজির হওয়া স্পিরিট বা রুহ (পুরুষ)-কে তিনি তুলনা করেছেন ঈসা মসিহের রুহের সাথে। রুমি এবং ইবনে আরাবীর মতো দার্শনিক সুফিরা সেই মোকামে পৌঁছাবারই চেষ্টা করেছেন– যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতি, আদম ও হাওয়া এবং আদ্যমাতা ও নূর নবীর মধ্যে ফারাক থাকে না (বা এসবই আসলে একই সত্তার বিভিন্ন নামরূপ)। আমাদের লালন ফকিরও এই সিলসিলা বজায় রেখে প্রশ্ন করেছেন, "কোন নূরেতে আদম বলো হয়? মা হাওয়া কি সেই নূরেতে নয়?"

আমরা এখন যেই নিওলিবারাল দুনিয়ায় বাস করি, তাতে নারীর সম্পত্তির অধিকারকে পুঁজিবাদী প্রাইভেট সম্পত্তির ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে বন্দী করে ফেললে মুসলিম নারীদের মানবিক মর্যাদা ও সম্পদের উপর মালিকানা আদায়ের সংগ্রামকে কতটুকু ফলপ্রসূ করা যাবে, তাতে সন্দেহ আছে। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাকে ন্যায্যতা দানকারী লিবারাল মূল্যবোধের অবস্থান থেকে ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলা একটি সীমাবদ্ধ (পুঁজিবাদের সীমার মধ্যে) তরিকা। তার বদলে বাংলাদেশের সমাজে নারীর আত্মমর্যাদা ও সম্পদের অধিকারের প্রশ্নটি একটি নতুন সমাজ কায়েম করার সংগ্রামের সাথে যুক্ত প্রশ্ন হিসাবে দেখাটাই ফলপ্রসূ হবে। অর্থাৎ এমন একটি সমাজ কায়েমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বিষয়ক আলাপ ও তৎপরতা চালাতে হবে– যেই সমাজটি দুনিয়ার মাটিতে সেই মোকামটিকেই ধরতে চাইবে, যেই শূন্যতার মোকামে (লা মোকাম) প্রকৃতি ও পুরুষ কিংবা আদম ও হাওয়ার মধ্যকার ক্ষমতা-সম্পর্কগত ভেদ ঘুচে যায়। মানুষ হিসাবে আমাদের স্বরূপ দর্শনের সংগ্রামের চাইতে এই বস্তুগত সংগ্রামটি আলাদা নয়।

"লা মোকামে আছেন নূরী
সে কথা অকৈতব ভারি
লালন কয় দ্বারের দ্বারী,
আদ্যমাতা সে।"

লেখক: গবেষক ও রাজনৈতিক কর্মী

সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি

শম্পা বসু

বাংলাদেশের সর্বশেষ জনসংখ্যা জরিপের তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে নারী ৫১ শতাংশ এবং পুরুষ ৪৯ শতাংশ। জনসংখ্যার দিক থেকে নারীদের সংখ্যা বেশি হলেও দেশে ভূমির মালিকানা প্রশ্নে নারীদের অবস্থান একদম প্রান্তিক। বাংলাদেশে পুরুষেরা ৯৬ শতাংশ জমির মালিক, নারীদের মালিকানায় রয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ জমি। এর অন্যতম কারণ বাংলাদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনটি বৈষম্যমূলক ও পুরুষতান্ত্রিক। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।" কিন্তু আমাদের দেশে পারিবারিক আইন ধর্মীয় বিধি দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও সন্তানের অভিভাবকত্বের বিষয়ে আইনগতভাবেই বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন।

সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ধর্মীয় আইনগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থান সবচেয়ে অবহেলিত। এখানে ভাই থাকলে বোন কোন পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন না। নারীর নিজস্ব অর্জিত সম্পত্তি বা উপহার সামগ্রী ছাড়া এক কথায় স্ত্রীধন ব্যতিত আর কোন সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্ব নারী এখনও পান না। ২০২০ সালে হাইকোর্টের একটি রায়ে স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকারের কথা বলা হয়েছে। যদিও তা এখনও আইনে পরিণত হয়নি। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের অনুরূপ। আর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষের অংশ সমান। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে একজন নারী পুরুষের চাইতে অর্ধেক সম্পত্তি পান। বিপরীতে একজন পুরুষ তার পিতা ও স্ত্রীর সম্পত্তিতে নারীর চেয়ে দ্বিগুণ সম্পত্তি পান। এটা গেল আইনের দিক। কিন্তু বাস্তবে সমাজে এমন ধারণা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যে, যে সকল মেয়েরা বাবার বাড়ির সম্পত্তি নেয় তারা সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে নিচু স্তরের। মিথ্যা এই আভিজাত্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করে রাখার কারণে বোনের সম্পত্তি সাধারণত ভাইয়ের ভোগ দখলে চলে যায়। মাতাও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে

তার সম্পত্তি ভাগের প্রশ্ন তোলেন না। এভাবেই পারিবারিক, সামাজিক ও আইনী বৈষম্য সৃষ্টি করে নারীদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়।

সম্পত্তির উত্তরাধিকারসহ পারিবারিক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ধর্মীয় আইন বলবৎ থাকায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীকে অধস্তন ভাবার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। পরিবারে শিশু অবস্থা থেকেই ছেলেটি বুঝে যায় বোন তার মতো অধিকার ও মর্যাদা পাবে না। কন্যা শিশুটিও বেড়ে ওঠে সেই বৈষম্যমূলক পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যা তাকে হীনমন্য করে তোলে। অধিকাংশ পরিবারের অভিভাবকও ছেলে আর মেয়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পোষণ করেন। আমাদের দেশে এত যে বাল্যবিবাহ– দারিদ্র্য ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি আরও একটি বড় কারণ কন্যা শিশুকে বোঝা মনে করা। আর এর সূত্রপাত এই বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন ও সামাজিক প্রথা থেকে।

বাংলাদেশ কোন ধর্মীয় রাষ্ট্র নয় বিধায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আইনের মূল ভিত্তি এখনও গণতান্ত্রিক নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রেণিগত প্রশ্নটি বাদ দিলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে এমন ৯৯ ভাগ আইনই ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার জন্য সমান অর্থাৎ আইনগুলো আপেক্ষিক অর্থে নিরপেক্ষ ও সর্বজনীন। রাষ্ট্র নানা বিবেচনায় যেমন নতুন আইন তৈরি করে, তেমনি বিদ্যমান আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন-পরিবর্তন-পরিমার্জনও ঘটিয়ে থাকে। অকার্যকর ও যুগের অনুপযোগী আইন বাতিলও করে থাকে। যখনই সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার দাবি তোলা হয় তখনই নীতি নির্ধারকগণ বলে থাকেন আমাদের দেশে যেহেতু ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলিম সম্প্রদায়ের, ফলে সম-অধিকার আইন বাস্তবসম্মত নয়। আসলেই কি তাই? কখনোই কি ধর্মীয় বিধির কোন পরিবর্তন মুসলিম সম্প্রদায় মেনে নেননি? অথচ আমরা দেখি বিষয়টি তেমন নয়।

ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী কোন নাবালক তার দাদা বা নানার সম্পত্তি পাবে না যদি দাদা/ নানার পূর্বেই তার বাবা/ মা মারা যায়। কিন্তু ১৯৬১ সালে প্রণীত 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ'-এর ৪ নং ধারা অনুযায়ী নাবালক সন্তান তার দাদা/ নানার সম্পত্তির ততটুকু পাবে যতটুকু তার বাবা/ মা পেত। ধর্মীয় বিধি অনুসারে একজন মুসলিম পুরুষ সর্বোচ্চ চারজন নারীকে বিয়ে করতে পারলেও ১৯৬১ সালের আইনের ৬ নং ধারা অনুযায়ী সালিশ পরিষদের সম্মতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করলে ওই ব্যক্তির এক বছর পর্যন্ত জেল অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। সাধারণত মুসলিম বিধান অনুযায়ী মৌখিকভাবে তালাক দেওয়ার সুযোগ থাকলেও বর্তমান আইনে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এছাড়া ফৌজদারী আইনের বিভিন্ন ধারায় এমন সব বিধান আমরা মেনে চলি যার সাথে ধর্মীয় আইনের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। যেমন চুরি করলে হাত কেটে দেওয়ার বিধান কিংবা ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ নারীকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ঘরে আটকে রাখার ধর্মীয় বিধান আমাদের দেশের প্রচলিত আইনে স্বীকার করা হয়নি। অনুরূপভাবে ধর্মীয় বিধান মোতাবেক একজন পুরুষ সাক্ষীর সমকক্ষ হিসাবে দুইজন নারী সাক্ষীর কথা বলা হলেও বর্তমান ফৌজদারী আইনে সাক্ষী হিসাবে একজন নারীকে একজন পুরুষের সমকক্ষ হিসাবেই ধরা হয়। এভাবে অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে দেখানো যাবে মুসলিমদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস বা আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এমনকি

সাংঘর্ষিক অনেক আইন প্রচলিত আছে এবং নতুন করে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা মুসলমানরা তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মেনে চলছে। এমনকি আইনের পরিবর্তনের ফলে আজকে ধর্ম পালন করতে হলেও ধর্মের বিধান লঙ্ঘন করতে হচ্ছে। যেমন অনেকেই জানেন, বহু ওলামা-মাশায়েখ ছবি তোলাকে হারাম ও কুফরি বলে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ কোন ব্যক্তি হজ্ব করতে চাইলে তাকে পাসপোর্ট আইনের বিধান মেনে ছবি তুলতে হয়। সেই ছবি সংযুক্ত পরিচয়পত্র গলায় ঝুলিয়ে তাকে হজ্ব করতে হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার একটি শ্লোগান প্রচার করে থাকে, "ছেলে হোক, মেয়ে হোক– দুটি সন্তানই যথেষ্ট"। কিন্তু কথা হল যখন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে মেয়ে সন্তানকে ছেলে সন্তানের সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য, তখন সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছেলে ও মেয়ে সন্তানের মধ্যে বৈষম্য বিলোপ না করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে কি? সন্তান সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক– দুজনেই যখন সমান, তখন সম্পত্তিতে তাদের সম-অধিকার কেন থাকবে না?

সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার এ যুগের একটি যৌক্তিক দাবি। কেননা সভ্যতা বলতে শুধু পুরুষ সভ্যতা কিংবা নারী সভ্যতা বোঝায় না। নর-নারী মিলেই মানব সভ্যতা। ফলে নর-নারীর মধ্যে অধিকারের অসমতা ও বৈষম্য বহাল রেখে সভ্যতা নির্মাণ, রক্ষা করা বা এগিয়ে নেওয়া যায় না। একইভাবে জনগণের শাসন তথা গণতন্ত্র বলতে শুধু জনগণের পুরুষ অংশ কিংবা নারী অংশের শাসন বোঝায় না। স্বভাবতই নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ফলে সভ্যতার রক্ষা কিংবা প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করার স্বার্থেই নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান সকল বৈষম্যের মতোই সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বৈষম্য বিলোপ করা জরুরি। এখানে প্রসঙ্গত বলা যায়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার একটি শ্লোগান প্রচার করে থাকে, "ছেলে হোক, মেয়ে হোক– দুটি সন্তানই যথেষ্ট"। কিন্তু কথা হল যখন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে মেয়ে সন্তানকে ছেলে সন্তানের সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য, তখন সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছেলে ও মেয়ে সন্তানের মধ্যে বৈষম্য বিলোপ না করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে কি? সন্তান সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক– দুজনেই যখন সমান, তখন সম্পত্তিতে তাদের সম-অধিকার কেন থাকবে না?

আমাদের দেশে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে পুরুষ বেশি সম্পত্তি পেয়ে থাকেন। এর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে অনেকেই বলেন পুরুষ যেহেতু নারীর ব্যয়ভার বহন করে, ফলে তারা উত্তরাধিকার সূত্রের সম্পত্তি বেশি পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় এ অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। বর্তমানে নারীরা রাজনীতি-অর্থনীতিসহ সামাজিক-রাষ্ট্রীয় জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। বিশেষ করে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা আজ অস্বীকার

করার কোন উপায় নেই। প্রতিটি পরিবারেই নারী সন্তান লালন-পালন, রান্নাসহ নানাবিধ গৃহকর্মে শ্রম দিয়ে যে মূল্য তৈরি করছে তার পরিমাণ বিরাট। কৃষক পরিবারগুলোতে নারীরা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে শ্রম দিয়ে থাকেন। এমনকি বেশিরভাগ দরিদ্র পরিবারে পিতা সন্তান ফেলে রেখে চলে যায় বা পুনরায় বিয়ে করে স্ত্রী-সন্তান ফেলে চলে যায়, সেক্ষেত্রে নারীরাই সন্তানকে আগলে রেখে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। আর বর্তমানে গার্মেন্টসের নারী শ্রমিকসহ সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত নারীরা তাদের পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছে, কেউ কেউ পুরো পরিবারের আর্থিকসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করছে। পুত্র সন্তানের অবর্তমানে অথবা তাদের অবহেলায় ফেলে যাওয়া বৃদ্ধ বাবা-মা, এমনকি শ্বশুর-শাশুড়ির দায়িত্ব পালন করছে বহু নারী।

সেই এক শতাব্দী আগে বেগম রোকেয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবি তুলে বলেছিলেন, "আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের 'অর্ধেক' নহি, তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত– পুত্র যেখানে দশ মাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস! পুত্রের জন্য যতখানি দুগ্ধ আমদানী হয়, কন্যার জন্য তাহার অর্ধেক! সেরূপ ত নিয়ম নাই! আমরা জননীর স্নেহ-মমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃহৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব, ঈশ্বর পক্ষপাতী? তিনি কি মাতা অপেক্ষা অধিক করুণাময় নহেন?"

আমরা প্রত্যাশা করি, উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের একটি দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং সমাজে নারীরা যে কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক নয়– তা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। মেয়ে সন্তান ও ছেলে সন্তানের মধ্যে এই বৈষম্য যে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তৈরি করে তা-ও কেটে যাবে। সমাজে নারীদের সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথে বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটবে। বিশ্বের বেশিরভাগ উন্নত দেশই সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। হিন্দু প্রধান দেশ ভারতে ধর্মীয় প্রথার অধিকাংশই বাতিল ও সংস্কার করা হয়েছে। আবার মুসলিম প্রধান দেশ তুরস্ক, তিউনিশিয়াসহ আরো কয়েকটি দেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে যেমন ধর্মীয় কোন পার্থক্য নেই, তেমনি পারিবারিক আইনসমূহকেও দেওয়ানী আইন ও আদালতের আওতায় এনে ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রবর্তন করে পারিবারিক আইনের পার্থক্য দূর করা সম্ভব। আমরা আশা করি সরকার অবিলম্বে সিডও সনদ, সংবিধান ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সমাজে বিরাজমান বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীর ক্ষমতায়নের বাস্তব পদক্ষেপ হিসাবে উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে সমাজে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

লেখক: সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, কেন্দ্রীয় কমিটি

হিন্দু নারী এক ঠিকানাবিহীন ভাসমান মানবসত্তা

ভানুলাল দাস

মুসলিম মেয়ে পিতার সম্পত্তির অধিকার পায়, খ্রিস্টান মেয়ে পায় এবং কেউ কেউ এই সম্পত্তি না নিয়ে ভাইকে দিয়ে দেয়। 'অধিকার' এক জিনিস, 'দেওয়া' বা 'না নেওয়া' আরেক জিনিস।

হিন্দু কোন ছেলেকে কি অন্য ছেলে, বোন বা কাকা বলতে পারবে, "তুমি বাপের সম্পত্তি পাবে না?" না। এমন বলতে পারবে না। কারণ হিন্দু ধর্মীয় আইনে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার (উত্তর + অধিকার) পুত্র পায়। উত্তরাধিকার একটি অধিকার। এই উত্তর 'অধিকার' পাওয়া ছেলে বা মেয়ে নির্বিশেষে সকল সন্তানের অধিকার হওয়া উচিত। জৈবিকভাবে কন্যা ও পুত্র উভয়ে পিতার সম-সংখ্যক ক্রোমোজম শরীরে বহন করে। একটি কমও না, বেশিও না। পিতা বা মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার (Heridity) মানুষের অন্যতম সর্বজনীন মানবাধিকার। কিন্তু হিন্দুর প্রথাসিদ্ধ দায়ভাগ আইনে সন্তান শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত।

এই বৈষম্য বিষয়ে কিছু সনাতন হিন্দু পুরুষ ও নারীর যুক্তিতর্ক শুনে হতভম্ব হয়ে যাই– হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারি না। তারা বলেন, "মেয়ের বিয়েতে পিতাকে অত্যধিক যৌতুক দিতে হয় বিধায় পিতার সম্পত্তির অধিকার হিন্দু মেয়েরা পায় না।" তাহলে ভারতে ১৯৫৬ সালে আইন করে নারীর সম্পত্তির অধিকার দেয়া হয়েছিল কি এই কারণে যে, সেখানে তখন কনের বিয়েতে তার বাপ-মা যৌতুক দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে তারা বোবা সেজে থাকেন।

ধর্মীয় অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, দত্তক গ্রহণ, পোষ্যদের ভরণ-পোষণের (মা, স্ত্রী, অবিবাহিতা ভগ্নি ও সন্তান) নিয়মাবলি হিন্দুর বেলায় কিছুটা ধর্মীয় ও প্রথাসিদ্ধ বিধান। এই প্রথাসিদ্ধ বিধান মতে বোনের বিবাহ হয়ে গেলে তার দায়ভার আর ভাইয়ের থাকে না। বিধবা হয়ে বা স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে বোন ফেরত আসলে ভাই দয়া করে স্থান দিলে ভালো, না হলে বোনকে বাস্তবিক অর্থে পথে দাঁড়াতে হয়। পিতার বিশাল সহায়-সম্পত্তি বাড়ি-ঘর থাকলেও কন্যার কোন উপকারে আসে না। দয়ার পাত্রে পরিণত হয় কন্যা। যেন জলে ভাসা শ্যাওলা।

❝

নারীকে ঠিকানাহীন করে রেখে সভা-সমিতি ও টকশোতে প্রামাণিক, বিশ্বাস, পাল, দাশগুপ্ত বাবুরা জোর গলায় বলে বেড়াচ্ছেন সনাতন হিন্দুরা নারীকে দেবীর সম্মান দেয়। হিন্দু নারীর প্রতি এরচেয়ে নির্মম পরিহাস আর কিছু হতে পারে না!

শুধু মেয়ে হওয়ার জন্য নারীকে ঠিকানাবিহীন হতে হবে কেন? বাবা, স্বামী, পুত্র কারও স্থাবর সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর স্থায়ী অধিকার বা মালিকানা নাই। বিয়ের আগে নারীর ঠিকানা পিতার ঠিকানা, বিয়ের পরে তার ঠিকানা স্বামীর ঠিকানা এবং বার্ধক্যে নারীর ঠিকানা পুত্রের ঠিকানা। বস্তুত, হিন্দু নারী ঠিকানাহীন এক পরগাছা। হিন্দু নারীর কোন স্থায়ী ঠিকানা নাই। বিয়ের আগে বাপের বাড়ি, বিয়ের পরে স্বামীর বাড়ি, বুড়োকালে পুত্রের বাড়ি! এই ঠিকানাগুলো হিন্দু নারীর অস্থায়ী ঠিকানা। কারণ আইন অনুযায়ী কারও স্থায়ী স্থাবর সম্পত্তি না থাকলে তার কোন স্থায়ী ঠিকানাও থাকে না। যার স্থায়ী ঠিকানা নাই, সে প্রকারান্তরে ঠিকানাহীন। ভাসমান মানুষ। আক্ষরিক অর্থে হিন্দু নারী ঠিকানাবিহীন ভাসমান এক মানবসত্তা।

❝

জৈবিকভাবে কন্যা ও পুত্র উভয়ে পিতার সম-সংখ্যক ক্রোমোজম শরীরে বহন করে। একটি কমও না, বেশিও না।

নারীকে ঠিকানাহীন করে রেখে সভা-সমিতি ও টকশোতে প্রামাণিক, বিশ্বাস, পাল, দাশগুপ্ত বাবুরা জোর গলায় বলে বেড়াচ্ছেন সনাতন হিন্দুরা নারীকে দেবীর সম্মান দেয়। হিন্দু নারীর প্রতি এরচেয়ে নির্মম পরিহাস আর কিছু হতে পারে না!

লেখক: হিন্দু আইন সংস্কার আন্দোলনের কর্মী

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় চাই উত্তরাধিকারে সম-অধিকার

সীমা মোসলেম

নারীর সমতা বিরোধী অচলায়তনের ভিত খুবই শক্ত। নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের ইতিহাস সহস্র বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাস। মানব সমাজে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান হলেও আর্থ-সামাজিক ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষ হিসাবে নারী সমমর্যাদা ও ন্যায্যতা পায় না। ঘরে-বাইরে নারী নানাভাবে বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার হয়।

মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণের পর সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে সমাজ যখন নারী-পুরুষে ভিন্নতা তৈরি করে, তখনই শুরু হয় বৈষম্য। অর্থাৎ নারী-পুরুষের ধারণাটি সমাজ দ্বারা নির্মিত। সিমন দ্য ব্যুভোয়ার বলেছেন, "কেউ নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, ক্রমান্বয়ে নারী হয়ে ওঠে।" সমাজের এই নারী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার কাঠামোয় নারীর অবস্থান হয়ে ওঠে অধস্তন। এর ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে নারীর প্রতি প্রাধান্য বিস্তারের মনোবৃত্তি সমাজ অনুমোদন দেয়। সমাজে প্রচলিত গৎবাঁধা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে প্রতি মুহূর্তে নানা ধরনের সহিংসতাসহ সম-অধিকার ও মর্যাদা অর্থাৎ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

নারী তার এই অধিকারের প্রশ্নে সবসময় ছিল সোচ্চার। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলনের ইতিহাস সেটাই আমাদের সামনে তুলে ধরে। সমাজ, সভ্যতা ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির সাথে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও সমতার বিষয়টি গভীরভাবে সম্পর্কিত এবং সেটি ক্রমান্বয়ে সামনে আসতে থাকে। জাতিসংঘ গৃহীত কতক পদক্ষেপ ও উদ্যোগ নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নটিকে বৈশ্বিকভাবে গুরুত্ব প্রদান করে। ১৯৭৫-এর নারীবর্ষ, ১৯৭৬-৮৫ পর্যন্ত নারীদশক ঘোষণা এবং এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫-তে অনুষ্ঠিত হয় চারটি আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে গৃহীত বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম-পরিকল্পনায় নারীর অগ্রগতি ও সমতার লক্ষ্যে ১২ টি উদ্বেগজনক ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়, যা নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করছে এবং জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ।

১৯৬৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপের সুনির্দিষ্ট নীতি ঘোষিত হয়, যা ১৯৭৯ সালে 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' (সিডও সনদ) হিসাবে গৃহীত হয়। ১৯৮৩ সাল থেকে এর কার্যকারিতা শুরু হয়। এটি জাতিসংঘের সাতটি মৌলিক মানবাধিকার সনদের মধ্যে অন্যতম। সিডও সনদ ঘোষণায় নারীর মানবাধিকার তথা পরিবার, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, ব্যক্তিগত পরিসর ও জনপরিসরের সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশ সরকার সিডও সনদের অন্যতম মূল দুই ধারা [২ নং এবং ১৬ (১)-এর গ] সংরক্ষণ রেখে সিডও সনদে স্বাক্ষর করে। এখানে উল্লেখ্য, ২ নং সনদে রয়েছে বৈষম্য বিলোপের নীতি যাকে বলা হয় সিডও সনদের প্রাণ। সেখানে বলা হয়েছে জাতীয় সংবিধান বা অন্য কোন আইনে সমতার নীতি অন্তর্ভুক্ত হয়ে না থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রচলিত যেসব আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো পরিবর্তন অথবা বাতিল করে আইন প্রণয়নসহ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অর্থাৎ আইনসহ রাষ্ট্রের সকল বিধি-বিধানে সমতার এমন নীতিমালা গ্রহণ যা সংবিধানের ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, "নারীর অধিকার মানবাধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন।" নারীর মানবাধিকারের বিষয়টি এভাবে ক্রমান্বয়ে সামনে আসতে থাকে। বৈশ্বিক নানামুখী উদ্যোগ ও ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেশে দেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও ক্রমান্বয়ে সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে থাকে।

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনেরও রয়েছে ধারাবাহিক ইতিহাস। সমাজ সংস্কার আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনসহ সকল কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে ছিল নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ছিল তিনটি ধারায়–মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে অংশগ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধের সহায়তাকারী হিসাবে এবং নারী হওয়ার কারণে ভিন্ন মাত্রার ব্যাপক সহিংসতার শিকার হওয়া। মুক্তিযুদ্ধে পুরুষ সদস্যের শহীদ হওয়ার কারণে বহু নারী প্রধান পরিবারও সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নারীর মধ্যে এক ধরনের জাগরণের জন্ম দিয়েছে। তৈরি করেছে আত্মবিশ্বাস এবং সীমিতভাবে হলেও তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ লাভ করে নতুন সংবিধান। নতুন দেশের নতুন সংবিধানে সম-অধিকারের প্রত্যয় বিবৃত হয়। সংবিধানের ১০, ১৯, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০ ধারা ও উপধারায় নারীর সমান অধিকারের ঘোষণা সন্নিবেশিত হয় যা মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

সমাজের পরিবর্তন ঘটছে, বাংলাদেশে নারীর অবস্থা ও অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটছে। নারী তার আত্মশক্তিতে সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারী এখন দৃশ্যমান। এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে নারীর পদচারণা নেই। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মানদণ্ড শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নারীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। পোশাকশিল্পে নারীর অংশগ্রহণ ও অভিবাসী নারীর ভূমিকা এখানে উল্লেখ করা যায়। শ্রম আইন সংস্কার এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী সব অধিকার সুরক্ষা করে পোশাকশিল্পে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু নারীর এই অগ্রসরময়তার ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের যেরকম সহায়ক শক্তি হিসাবে পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন ছিল, সেটা অনুপস্থিত। রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নে নারীর অংশীদারত্বের প্রশ্ন উঠলে নারীর প্রতি সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মনোকাঠামো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ

সময়কালে নারীর প্রতি সংবেদনশীল নানা আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু সেসব আইনের বাস্তবায়নে রয়েছে নানা দুর্বলতা। উত্তরাধিকারে নেই নারীর সম-অধিকার। শ্রমে নেই সম-মজুরি। গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজ এখনও অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসাবে স্বীকৃত নয়।

কৃষিকাজে নারীর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু জমির মালিকানা না থাকায় কৃষক হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না, কৃষিকার্ড পাচ্ছে না। সরকারি খাসজমি প্রদানের ক্ষেত্রেও নারী হিসাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ এখনও প্রধানত অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পাবলিক সেক্টরে নিয়োজিত নারী শ্রমশক্তি মাত্র ৩.২৫ শতাংশ এবং ৮.২৫ শতাংশ প্রাইভেট সেক্টরে। বাকি ৮৯.৫ শতাংশ নারী অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে কাজ করছে। প্রতিদিন একজন কর্মজীবী নারী গড়ে একজন পুরুষের তুলনায় প্রায় তিন গুণ কাজ করেন যা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। এর সঙ্গে রয়েছে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর সুযোগের সীমাবদ্ধতা। ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে নারীশ্রম এখনও অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে।

জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে ২০০৪ সাল থেকে জেন্ডার বাজেট ঘোষিত হয়ে আসছে। কিন্তু এই বিনিয়োগ জেন্ডার সমতায় কী ভূমিকা রাখছে সে বিষয়ে কোন তথ্য নেই। জেন্ডার বাজেট হতে হবে ন্যায্যতার ভিত্তিতে যা জেন্ডার গ্যাপ নির্ণয় এবং নারীর বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থানের চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত হবে। অধিকার, সমতা ও সুযোগ একে অপরের পরিপূরক। সুযোগের প্রাপ্যতা না থাকলে অধিকার আদায় হয় না– আর অধিকার ও সুযোগের সমন্বয়ে যদি সম-ফলাফল অর্জিত না হয় তবে অধিকার বাস্তবায়ন হয়েছে বলা যায় না। যার প্রতিফলন বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। সর্বাপেক্ষা ন্যাক্কারজনক ও অবমাননাকর বৈষম্য হচ্ছে একই পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পিতার সম্পত্তিতে বোনের ভাইয়ের সমান অধিকার না পাওয়া। তখনই প্রশ্ন আসে, “কন্যা তুমি কার?” সম্পত্তিতে অধিকারহীনতা নারীকে অধস্তন করে রাখছে, সমাজে নারীর প্রতি প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি জিইয়ে রাখছে। নারী-পুরুষের মধ্যে এই বৈষম্যের বীজ পরিবারের অভ্যন্তরে ও একান্ত ব্যক্তিজীবনে প্রোথিত হয়ে আছে– যা সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্যের অভিঘাত হানছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও নারীর ব্যক্তিজীবন এখনও পারিবারিক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। সংবিধানের সমতার ঘোষণার বিপরীতে এখনও সমাজে প্রতিটি ধর্মগোষ্ঠীর নারীদের জীবন ও অধিকার ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। নারীর ব্যক্তি অধিকারের ক্ষেত্রে এই অসমতা নারীকে সমাজে অধস্তন করে রাখছে। এই অসমতার কারণে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে নারী বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং মর্যাদাহীন থাকছে। বিভিন্ন ধর্মের পারিবারিক আইন দ্বারা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্বের মতো বিষয়গুলো নির্ধারিত হচ্ছে যা বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন ধর্মের পারিবারিক আইনে ভিন্নতা থাকার কারণে একই দেশের নাগরিক নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। একইভাবে বিভিন্ন ধর্মের নারীর অধিকারের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। যেমন: হিন্দু নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ ও পৈতৃক সম্পত্তিতে কোন রকম অধিকার নেই, সেখানে মুসলিম নারীর

বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কাবিননামায় উল্লেখ থাকে স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হল, যা খুবই অপমানজনক। পিতার সম্পত্তিতে মুসলিম নারীর আংশিক প্রাপ্যতা থাকলেও হিন্দু ও বৌদ্ধ নারীর সেই অধিকার নেই। ফলে দেশের নাগরিক হিসাবে নারীদের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানেও ভিন্নতা দেখা দিচ্ছে। এই অসমতা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী এবং সর্বজনীন মানবাধিকার ও সিডও সনদেরও পরিপন্থী। বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"– এই বক্তব্যের সাথেও সাংঘর্ষিক।

সংবিধানের সমতার ধারাগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান করে নারীর সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন 'অভিন্ন পারিবারিক আইন' (Uniform Family Code) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তথা বাংলাদেশের নারী আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে আইন বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের সদস্যদের সাথে আলোচনা এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পরামর্শে 'অভিন্ন পারিবারিক আইন'-এর খসড়া প্রণয়ন করেছে। নাগরিক সমাজ, আইনবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাধারণ নারীদের সঙ্গে আইনের প্রস্তাবনা নিয়ে ব্যাপকভাবে মত বিনিময় করা হয়। সকলের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া আইনটি প্রণীত হয় এবং ১৯৯৩ সালে তৎকালীন সরকারের কাছে তা জমা দেওয়া হয়। বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও দত্তকগ্রহণ বিষয়ে নারী-পুরুষের সমতার আলোকে অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধান প্রদত্ত নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে এই খসড়া আইন প্রণীত হয়।

নারীর প্রতি অধস্তন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, ক্ষমতার কাঠামোয় নারীর সমতাপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজন জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বিত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নারীর সম-অংশগ্রহণ, একই সঙ্গে নারীর জন্য বিনিয়োগ মানবাধিকার ইস্যু হিসাবে বিবেচিত হতে হবে এবং সম্পদে থাকবে নারীর পূর্ণ অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ। এর জন্য প্রয়োজন উত্তরাধিকার আইনে সমতা, নারীর ব্যক্তিজীবনের অধিকারে সমতা। নারী সমাজকে পিছনে রেখে রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির উন্নয়ন সম্ভব নয় সেটা সহজেই অনুধাবনযোগ্য। তাই সংবিধানে বিবৃত নারী-পুরুষের সমতার আলোকে প্রণীত 'অভিন্ন পারিবারিক আইন' (Uniform Family Code) বাস্তবায়ন আজ সময়ের দাবি। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রসহ সকল রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার।

লেখক: যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

মুসলিম আইন পরিবর্তনের গতিধারা

পুলক ঘটক

মানব ইতিহাসের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিকতায় আইন শাস্ত্র বিকশিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন মর্জির শাসকদের হাত দিয়ে বিভিন্ন রকম আইন হয়েছে। আইন শাস্ত্রের ইতিহাস বলছে প্রথম 'ইসলামী সিভিল কোড' বা 'মেসেলে-ই আহকাম' প্রবর্তন হয়েছিল অটোমান সাম্রাজ্যের আমলে ১৮৭৭ সালে। নতুন এই সিভিল কোড প্রণয়নের নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত আইনবিদ আহমেদ সেভদেত পাশা, যিনি ইউরোপীয় আইন ও রাষ্ট্রতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন। সঙ্গত কারণেই এ আইনের উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব বেশি বলে গবেষকেরা দাবি করেন। তবে প্রণেতাদের দাবি তারা 'আল কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ' দ্বারা অনুপ্রাণিত যার উৎস চারটি: ১. কোরান, ২. সুন্নাহ, ৩. ইজমা এবং ৪. কিয়াস।

হিন্দু পারিবারিক আইনের উৎস তারচেয়ে অনেক প্রাচীন। বেদ, সংহিতা, পুরাণ শাস্ত্র ও বিবেকের বাণীকে উৎস বিবেচনা করলে সম্ভবত বাংলাদেশের হিন্দু আইনই বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন জীবিত আইন। কিন্তু সেসব গ্রন্থ আইনের কথিত উৎস মাত্র। বিদ্যমান হিন্দু আইনে উৎসের নাম-গন্ধ আছে, মৌলিকত্ব কিছুই নেই। বাস্তবে ইংরেজরা প্রবর্তনের আগে 'হিন্দু আইন' নামে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। ইংরেজরা যে হিন্দু আইন করে গেছে তার সাথে ধর্মের সম্পর্ক 'হিন্দু' নামে। অঞ্চলভিত্তিক ও গোষ্ঠীভিত্তিক বিভিন্ন প্রথাকে ইংরেজরা আইনে পরিণত করেছিল। অথচ প্রথাগুলো কখনোই সকল অঞ্চলের সকল হিন্দুর জন্য সর্বজনীন আইন ছিল না, আজ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনসহ বিভিন্ন আদিবাসী ধর্মীয় সম্প্রদায়কে হিন্দু আইনের আওতায় ফেলা হয়। তার মধ্যেও অনেক বৈচিত্র্য। সেকালে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য এবং বিভিন্ন গোত্রের জন্য বিভিন্ন রকম হিন্দু আইন হয়েছিল, আজও আছে। ইংরেজ আমলেই আইনগুলো বহুবার সংশোধন হয়েছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর দেশটি ইংরেজদের আইন বাদ দিয়ে নতুন হিন্দু আইন বানিয়েছে। ইংরেজ শাসনমুক্ত নেপালের হিন্দু আইন আগে থেকেই স্বতন্ত্র ছিল।

এ কথার পর প্রিয় পাঠকবৃন্দ মুসলিম আইনের আদি ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক করতে চাইলে করতে পারেন। কেউ বলবেন মুসলিম আইন হযরত মুহাম্মদের আমল

থেকে শুরু হয়েছে, কেউ বলবেন, না, এ আইন তারও আগে ওল্ড টেস্টামেন্টের (ইহুদিদের তোরাহ, যা মুসলমানদের বিশ্বাসে তাওরাত নামক আসমানি কেতাব) সময় থেকে শুরু হয়েছে। কেউ কেউ বলতে পারেন মুসলিম আইনের শুরুটা খলিফা উসমানের আমলে কোরান সংকলনের মধ্য দিয়ে। কেউ হয়তো বলবেন উমাইয়া খেলাফতের সময় থেকে আব্বাসি শাসনামল পর্যন্ত হাদিস সংকলনের দুশো বছর সময়কালে ইসলামী আইন বিকশিত হয়েছিল। যার যা ইচ্ছা বলতে পারেন। মুঘলদের হাত দিয়ে, নাকি তারও আগে তুর্কি বা পাঠান শাসকদের হাত ধরে ভারতবর্ষে ইসলামী আইন চালু হয়েছিল তা নিয়েও বিতর্ক করতে পারেন। সে বিতর্কে আমি জোর দিব না। আমি শুধু ইতিহাসের বাস্তবতা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। তা হল বহুমাত্রিক পরিবর্তন।

যখনই আপনি কোরান ও সুন্নাহ'র পর ইজমা ও কিয়াসকে ইসলামী আইনের উৎস হিসাবে মেনে নিয়েছেন, তখনই আপনি আইনের পরিবর্তনধর্মী বাস্তবতা মেনে নিয়েছেন। কোরান এবং সুন্নাহ কী আমরা সবাই জানি। কিন্তু ইজমা ও কিয়াস কী? 'কিয়াস' হল তুলনা ও অনুমান। যখন কেউ নতুন বাস্তবতায় নতুন কোন সমস্যার মুখোমুখি হবে তখন অতীতের সঙ্গে (বিশেষত নবী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের অনুরূপ কোন ঘটনার সঙ্গে) তুলনা করে নতুন বাস্তবতায় কী হতে পারে তা অনুমান করবে। আর 'ইজমা' হল কোন বিষয়ে আলেমদের ঐকমত্য। এই ঐকমত্য জিনিসটা কঠিন। পণ্ডিতে পণ্ডিতে ঐকমত্য যত পাবেন, তত পাবেন বিরোধ। ঐক্য ও বিভেদ নিয়ে ইতিহাসে অশান্তি ও রক্তারক্তির নজির অসংখ্য। এ অবস্থা আজও চলছে। তুলনা, অনুমান ও ঐকমত্য দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ইসলামী আইন শুরুর দিন থেকেই পরিবর্তন হতে শুরু করে। সুতরাং আদি ইতিহাস যেভাবেই দেখুন– ইসলামী আইনের ধারাবাহিক ইতিহাস হল বহু মতের, বিচিত্র শাখার এবং নানাবিধ পরিবর্তনের ইতিহাস।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী আইন (ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ আইন) এবং রাষ্ট্রকাঠামো বিভিন্ন রকম। আফ্রিকার মুসলিম প্রধান দেশগুলোর আইনের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের আইন মিলছে না। খোদ আরব ভূমিতে যতগুলো দেশ আছে তারা সবাই রাষ্ট্র কাঠামো এবং ইসলামী আইনের প্রশ্নে এক ও অভিন্ন অবস্থানে নেই। ভূচিত্রে পশ্চিমের তুরস্ক থেকে পারস্য (ইরান) হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ হয়ে একদম পূর্ব দিকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত যান– এই দেশগুলোতে এক ও অভিন্ন ইসলামী আইন পাবেন না। অথচ প্রত্যেকটি দেশে কোন-না-কোন প্রকার ইসলামী আইন আছে এবং অতীতে অথবা বর্তমানে ইসলামী শাসকরা শাসন করেছে।

আধুনিক যুগে যারা দারুল ইসলাম চায় অর্থাৎ সরাসরি ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী শাসনতন্ত্র, ইসলামী (সামরিক, বেসামরিক, ফৌজদারী আইন) শরীয়া আইন চায়, তাদেরকেও আমি এসব বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে দেখিনি। জিজ্ঞেস করেছি, কেমন ইসলামী আইন চান? সৌদি স্টাইলের ওয়াহাবি শরীয়া আইন, ইরানের মত শিয়া আইন (কান-ই-মদানি), আফগান তালেবানদের মতো আইন, আইএস বা আল কায়েদার দেখানো আইন– কোনটি চান? নারীদের অবস্থা কেমন হবে, নারী নেতৃত্ব চলবে কি না ইত্যাদি প্রশ্নে এক এক করে যতজনকে জিজ্ঞেস করেছি কেউ আমাকে অভিন্ন ধারণা দিতে পারেনি। প্রত্যেকটি গ্রুপ নিজেদেরকে সহিহ মনে করে। অভিন্ন মুসলিম

পারিবারিক আইন পৃথিবীতে নেই। পড়াশোনা করে বিশ্ব মুসলিমের জন্য অভিন্ন ইসলামী আইনের কোন অস্তিত্ব আমি খুঁজে পাইনি। আইনের এযাবৎকালের ইতিহাসে তা নেই। পরিবর্তনই চিরন্তন ইতিহাস, পরিবর্তনই স্বাভাবিক ব্যাপার।

ইরানের বিদ্যমান 'ইসলামী শাসন' তুলনামূলকভাবে অনেক দিন থেকে স্থিতিশীল। তারাও তাদের আইন বহুবার পরিবর্তন করেছে। পরিবর্তনের আগেরটা ধর্মীয় থাকে, নাকি পরিবর্তনের পরে আইন ধর্মীয় হয় ভাবার বিষয়।

শিয়া, সুন্নি, হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী, ওহাবী আইনী ধারণাগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করে এই লেখার কলেবর বাড়াবো না। তাতে মূল প্রসঙ্গ হারিয়ে যাবে। মূল প্রসঙ্গ হল বাংলাদেশে হিন্দু আইন সংস্কারের দাবি দিনে দিনে প্রবল হওয়ার সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে বা অনিয়মিত বিরতিতে মুসলিম পারিবারিক আইন পরিবর্তনের দাবি সামনে আসছে। বাধাও আসছে। ২৬ এপ্রিল ২০২৪ 'নারী অঙ্গন' নামে একটি সংগঠন নরসিংদীতে 'পারিবারিক সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা' শিরোনামে আলোচনা সভা করতে চেয়েছিল। তাদেরকে কর্মসূচি স্থগিত করতে হয়েছে। কারণ প্রথমে নরসিংদী সরকারি কলেজ এবং পরবর্তীতে নরসিংদী প্রেস ক্লাব তাদেরকে বরাদ্দকৃত হলরুমে সভা করতে দেয়নি। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কলেজ ও ক্লাবের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের কতিপয় ব্যক্তির বাধার মুখেই কলেজ ও প্রেস ক্লাব তাদের ভেন্যুর বরাদ্দ বাতিল করেছে। 'নারী অঙ্গন' সাময়িকভাবে পিছু হটতে বাধ্য হলেও ঘোষণা দিয়েছে, "নারীর সমান উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াইয়ে আমরা আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।" এই দৃঢ়তাই সাফল্য। 'নারী অঙ্গন' সফল হয়েছে। ঢাকায় মহিলা পরিষদের মতো ঐতিহ্যবাহী সংগঠন এবং অনেক বড় বড় সুপ্রতিষ্ঠিত সংগঠন নারীর সম-অধিকারের দাবিতে অনেকবার আলোচনা সভা করেছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে নতুন একটি সংগঠন 'নারী অঙ্গন' তাদের চেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে, বেশি সফল হয়েছে। কারণ হল ঐ বাধা। যেখানে বাধা আসে, সেখানেই লড়াই তীব্র হয়। সে বাধাই আমার আলোচনার প্রসঙ্গ।

বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইন অনেকবার অনেকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ (Muslim Family Laws Ordinance, 1961) জারির মাধ্যমে একদফায় বড় পরিবর্তন করে গেছেন আইয়ুব খান। তার আগে মুঘল আমলে এবং বৃটিশ আমলেও পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, এরশাদ, খালেদা, হাসিনা– সবার আমলে মুসলিম পারিবারিক আইনের বিভিন্ন বিধানে পরিবর্তন এসেছে। যৌতুক নিরোধ আইন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধানকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে। এদেশে আদালতের আদেশেও আইনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মুখের কথায় তিন তালাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তালাকের ক্ষেত্রে নোটিশ দেওয়ার সিস্টেম চালু হয়েছে। নারীকেও তালাক দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। হিল্লা বিয়ের মতো নোংরামি নিষিদ্ধ হয়েছে। অভিভাবকত্ব আইন, সন্তানের পরিচয় নির্ধারণে মায়ের স্বীকৃতি, যৌনতায় সম্মতি প্রদানের বয়স, সাক্ষ্য আইন ইত্যাদির ক্ষেত্রে হিন্দু বা মুসলিম আইন চলছে না।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ভারতবর্ষে শরীয়া আইন চালু করেছিলেন। ইংরেজ শাসক ওয়ারেন হেস্টিংস হাত, পা ও মুণ্ডু কাটার আইন অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। ইংরেজরা সে আইন বাদ দিয়ে পেনাল কোড এবং সিআরপিসি ভিত্তিক ফৌজদারী শাসন ব্যবস্থা চালু করে গেছে। মুসলমানরা তা মেনে নিয়েছে। এখন যদি বাংলাদেশের বিদ্যমান ফৌজদারী আইন ও বিচার ব্যবস্থা বাতিল করে নতুন করে শরীয়া আইন চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে বর্তমান যুগের বাঙালি মুসলমানরা কয়জন সমর্থন করবে এবং কয়জন প্রতিবাদে নামবে জানি না। কিন্তু জমি-জমা ভাগাভাগির আইনের ক্ষেত্রে হাত দিলে বিরোধিতা প্রবল হয়। কারণ এর সঙ্গে সরাসরি ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত। আপাদমস্তক ধার্মিকও বিদ্যমান 'ধর্মের আইন' লঙ্ঘন করে বোনকে ঠকায়। সেই স্বার্থপর মানুষ আইন সংশোধন করে বোনকে সমান অধিকার দিতে সহজে রাজি হবে– এটা আশা করলে বেশি হয়ে যায়। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে বিরোধ এবং লড়াই অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু হোন অথবা মুসলমান হোন– যারা নারীর সম-অধিকার চান তাদেরকে বড় লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে মাঠে আসতে হবে। যারা পরিবর্তন চায় তারা বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। তাই বুদ্ধিমানরা যা চায় তা হয়।

“

আইনের ইতিহাস হল পরিবর্তনের ইতিহাস এবং বৈচিত্র্যের ইতিহাস। অতীতের সব পরিবর্তনের সময় ছোটখাটো বাধা আসলেও মানুষ আল্টিমেটলি পরিবর্তন মেনে নিয়েছে। শুভচিন্তা ও কল্যাণকামী পরিবর্তন মানুষ মেনে নেয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করে। সভ্যতার অগ্রগতি কেউ ঠেকিয়ে দিতে পারে না, পারবে না।

তবে সব সময় সবকিছু মাথায় হাত বুলিয়ে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হয় না। অটোমান সালতানাতের সময় নারী নেতৃত্ব নিষিদ্ধ থাকলেও অন্তত তিনজন পুরুষ সুলতানের মাথার উপর ছড়ি ঘুরিয়ে গেছেন মাহপেকার সুলতান ওরফে কোসেম সুলতান নামে খ্যাত এক বুদ্ধিমতী নারী। তিনি পর্দার অন্তরাল থেকে রাষ্ট্র শাসন করেছেন। সরাসরি সম্রাটের চেয়ারে বসতে না পেরেও প্রকৃত সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন। হুজুররাও তার মর্জিমাফিক ফতোয়া দিত। আজ অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে নারীরা সম্মুখ অবস্থানে থেকে শাসন করছে। এই বাংলাদেশেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে হুজুররা সমবেত হয়েছেন, আবার খালেদা জিয়ার নেতৃত্বেও হুজুররা সমবেত হয়েছেন। রাজনীতির খেলা এরকমই। নারী-পুরুষ ভেদ ঘুচে যায় ও যাবে– শুধু শুভবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন নারী-পুরুষকে একসাথে কাজ করতে হবে।

আগেই বলেছি, আইনের ইতিহাস হল পরিবর্তনের ইতিহাস এবং বৈচিত্র্যের ইতিহাস। অতীতের সব পরিবর্তনের সময় ছোটখাটো বাধা আসলেও মানুষ আল্টিমেটলি পরিবর্তন মেনে নিয়েছে। শুভচিন্তা ও কল্যাণকামী পরিবর্তন মানুষ মেনে নেয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করে। সভ্যতার অগ্রগতি কেউ ঠেকিয়ে দিতে পারে না, পারবে না। জয় মানুষ।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু আইন সংস্কার পরিষদ

সম্পত্তিতে সমানাধিকার: ন্যায্যতা ও মানবিক মর্যাদার প্রথম শর্ত

রেক্সোনা সুমি

ভাইয়ের পুত্রকে আমার কোলে দিতে দিতে আব্বা আহ্লাদ করে বলছিলেন, "বংশের বাতি।" মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো, "অন্যায্যতার শুরু এখানেই।" বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক পরিবার চিন্তার ধরনে কন্যা সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় করলে ভবিষ্যতে আলাদা সুফল বয়ে আনার নিশ্চিত সম্ভাবনা না থাকার কারণে নারীকে জন্মসূত্রেই বৈষম্যমূলক অবস্থার ভেতর দিয়ে বড় হতে হয়। একই কারণে যেহেতু সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে পেশিশক্তির প্রয়োজন রয়েছে, তাই পুরুষকেই পারিবারিক অধিকর্তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যে প্রতিষ্ঠার মধ্যে পেশিশক্তির পরিচর্যার যাবতীয় আয়োজন সুস্পষ্টভাবে অক্ষুণ্ন রাখা থাকে। অন্যদিকে নারীর জন্য ঠিক ততটুকুই বরাদ্দ করা হয় যার মাধ্যমে তার অধস্তনতার শিক্ষা সুনির্দিষ্ট করা যায়। এবং এই আয়োজন গোটাটাই নিশ্চিত করা হয় রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ হলেও বিয়ে, সন্তানের অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি বণ্টনের প্রশ্নে ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। যার জন্য অপরিণত বয়সে পাত্রস্থ করে বিদায় দেওয়ার আয়োজন মুখ্য হয়ে ওঠে। এই ব্যবস্থার কারণে কন্যাশিশু মনস্তাত্ত্বিকভাবেই এমন হীন বোধের ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠে যে, সে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে সক্ষম হয় না। নিজেকে দেখে অপরের দৃষ্টি দিয়ে। অর্ধ-দৃষ্টির এই যাত্রা সমাপ্ত হবার আগেই অধিকাংশ নারীর পরিবার বদল ঘটে, সেই সাথে মালিকানা বদলও। এই অপূরণীয় দৈন্যের ক্ষতিপূরণ কখনো-সখনো পিতৃপরিবারকে বহন করতে হয় যৌতুক নামক ব্যবস্থার মাধ্যমে। তাতে করেও শেষ রক্ষা খুব কমই হয়। অধিকার না বুঝতে শেখা নারী এতটাই তুচ্ছ, এতটাই অপর।

এই অমর্যাদাকর জীবনের শুরুটাই হয় শৈশবে ন্যায্য অধিকার হরণের মাধ্যমে। কন্যাশিশু শেখে তার নিজের কিছু নেই। ফলে আত্মরক্ষার জন্যই অধিক স্নেহ-মমতা আদায়ের লক্ষ্যেই তাকে মনোযোগী হতে হয় বাধ্যবাধকভাবে। একটি পুত্রশিশু শেখে পিতার অবর্তমানে সে-ই কর্তা। সে বেড়ে ওঠে অধিকতর যোগ্য শাসক হিসাবে যা কিছু নিয়ম সেগুলো চর্চার ভেতর দিয়ে। অন্যের অধিকার হরণও

তার অলিখিত অধিকারের আওতায় পড়ে। মূলত যে অধিকার হরণকারী স্বয়ং রাষ্ট্র এবং আইনী প্রক্রিয়া।

পূর্ণবয়স্ক একজন নারীর সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতা নির্দেশ করে তার অতীত যাপনের ইতিহাস। যেখানে জীবনের শুরুতেই তিনি মানবিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত 'ঊন মানুষ'। অর্থাৎ পারিবারিক সম্পদের মালিকানা প্রশ্নে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে কন্যার অধিকার পুত্র সন্তানের অর্ধেক, স্ত্রীর অধিকার স্বামী গত হলে আট ভাগের এক ভাগ। অথচ কন্যা ও স্ত্রীর ন্যায্য সাম্য থাকার কথা ছিল, যাতে বার্ধক্যে সম্পদের জন্য গঞ্জনার শিকার না হতে হয়। এই প্রশ্নেই নারীর প্রাথমিক পুষ্টি থেকে শুরু করে শিক্ষাগ্রহণ ব্যয়, শারীরিক বিকাশ, সামাজিক নিরাপত্তা, সম্পদ ব্যবহারের স্বাধীনতা, বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্যের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। যে নারী পিতৃগৃহ থেকে স্বামীর ঘরে যাবেন, তার জন্য বিনিয়োগ উসুল হবে না বিধায় বাজেট শুরুতেই কাটা হচ্ছে। বিষয়টা স্বীকার করতে নির্মম মনে হলেও এই বাস্তবতা খুব কম ক্ষেত্রে বদলানোর নজির আছে। বদলানো কঠিন, কারণ আইন দ্বারা অধিকার সীমায়িত করা হয়েছে। এই কারণেই রাষ্ট্রের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই নারীকে পূর্ণ মর্যাদার ভাবনায় জায়গা দেওয়ার অভ্যাস তৈরি হয় না। এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম অর্জনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে কিছু সুযোগ সৃষ্টি করা গেলেও, মূলগত বৈষম্যের কারণে আমূল পরিবর্তিত অথবা বিপদজনক পরিস্থিতিতে কী ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে সে বিষয়ে কল্পনা করা কষ্টকর হয়। এজন্য সকল কাজেই দেখা যায়, নারীদের যাবতীয় অর্জন ও সাফল্য থাকা সত্ত্বেও সমান ভাবতে পারার স্বস্তিকর অবস্থার অভাব থাকে– যদি না তারা তুল্য হবার যোগ্য উচ্চ ও পারিবারিক-সামাজিক মর্যাদার সুবিধাজনক শ্রেণিতে অবস্থান করেন। ক্ষেত্রবিশেষে নারীর নিজের অর্জিত সাফল্য ভোগ করার জন্যও উচ্চতর আর্থ-সামাজিক শ্রেণির পরিচয় দরকার হয়। ভেবে দেখা দরকার এই দ্বৈত পরিচয় বিনিয়োগ নারীর জন্য বাড়তি সুবিধা না দিয়ে কেবল ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিচ্ছে শুধু সে নারী হবার কারণে। এমনকি জ্ঞান উৎপাদনের সাথে পেশাগতভাবে যুক্ত অধিকাংশ নারীও আসলে তাত্ত্বিক আবহে জীবনযাপন করতে সক্ষম হোন না ঠিক এ সকল কারণে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যসহ অন্যান্য সম-পর্যায়ের আলাপেই তাদের অতিথি হিসাবে ডাক পড়ে। মানুষ হিসাবে নারীর সম-মর্যাদার প্রশ্নে এখনও যে বিরুদ্ধ মনোভাব প্রচলিত আছে, নীরবে তারই প্রতিফলন ঘটে নারীকে কেবল জেন্ডার আলাপের অংশ হিসাবে দেখার মাধমে। ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন নারীকেও লিঙ্গ সমতা ও ন্যায্যতার প্রসঙ্গেই ঘুরে-ফিরে আলাপ করতে হয়, যা কি না প্রকারান্তরে অসম্মানজনক।

অথচ সমানাধিকার কীভাবে ব্যক্তির উন্নয়নের বাইরেও ন্যায্য, সমৃদ্ধ দেশ ও জাতি গঠনে ভূমিকা রাখে সে দৃষ্টান্ত কল্যাণরাষ্ট্রগুলো প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছে। কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণার মধ্যেই রয়েছে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র নির্বিশেষে আইন সকলের জন্য সমান। অর্থাৎ সকল মানুষ সমান আইনী সুবিধা পাবেন এবং নিয়ম পালনে বাধ্য থাকবেন। এখানে উত্তরাধিকারের ধর্মীয় ও প্রথাগত ব্যবস্থার বিলুপ্তির ভেতর দিয়ে মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা সময়ের আবর্তনের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক চালচিত্র বদলের ফলে মানবিক মর্যাদার ধারণার বদল ঘটেছে।

ইতিহাস বলে ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের ফলে সারা পৃথিবীর আর্থ-রাজনৈতিক চেহারা বদলাতে শুরু করে, যা নিশ্চিতভাবে রাষ্ট্রসমূহের সমৃদ্ধির সম্ভাবনা ও অস্থিরতাকে প্রকট করে তোলে। আবশ্যিকভাবে নারীদেরকেও আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরে নিজেদেরকে নিচু স্তরের মানবিক অবস্থান বদলের জন্য লড়াইয়ে প্রস্তুত করে তোলে। দুটি স্বতন্ত্র অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যার সূচনা ঘটে ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এবং পরিণতি পায় বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ভোটাধিকার আদায়ের মাধ্যমে এবং শেষার্ধে এসে আইনগতভাবে সমান মজুরি নিশ্চিত করার ভেতর দিয়ে। তথাপি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেলায় এই সংগ্রাম এখনও সমানভাবে বহাল আছে। ২০২৪ সালে পৃথিবীর রোজগারের ক্ষেত্রসমূহ সকল ক্ষেত্রে আর সুনির্দিষ্টভাবে কারখানাভিত্তিক না থাকলেও একই রকম কাজে সমান পারিশ্রমিকের প্রশ্ন রয়ে গেছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই। কেন লিঙ্গভিত্তিক বেতন বৈষম্য এখনও বহমান, তার উত্তরও রয়েছে মূল প্রসঙ্গে। সম-অধিকারের শুরুই রয়েছে জন্মের সমান স্বীকৃতির মধ্যে। রাষ্ট্রীয় আইনের ভেতরেই নাগরিকের সর্বজনীন সমানাধিকার প্রশ্ন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির ওপর বর্তায়। ফলে সম্পত্তিতে সমানাধিকারের প্রশ্নের আগে নারী নিজেই অন্য কারোর অধীনে সম্পত্তির অংশ হিসাবে বাধ্যগত থাকেন। যে বাধ্যবাধকতা ব্যক্তি নারীর চিন্তার ক্ষেত্রেও সম্পদের স্বাধীন মালিকানার চিত্রকল্প তৈরি করে না। বরং রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তাকে ভীতিগ্রস্ত করে তোলে এবং পুনরায় নিশ্চয়তার জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষী করে।

"

অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা মানুষের ভিন্ন কোন দেশে বসবাসের সুযোগ এলেই উন্নত দেশসমূহে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু তাদের উন্নত দেশ হওয়ার পেছনে যে মানবিক মর্যাদার লড়াইয়ের ইতিহাস, উন্নত দেশ হিসাবে নিজেদের উত্তরণের জন্য শতভাগ নাগরিক সম-মর্যাদার বন্দোবস্ত, সেসব প্রশ্নে আমাদের পরিপার্শ্বে হিরণ্ময় নীরবতা অথবা বিরোধিতাই প্রবল হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর অনেক দেশই সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে সম-অধিকারের আওতায় বাস্তবায়ন করেছে। যার মধ্যে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের রাষ্ট্রও রয়েছে। তুরস্ক, রুয়ান্ডা, ভারত এবং তিউনিশিয়া বিশেষভাবে আলোচিত হয় এক্ষেত্রে। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সিডও (১৯৭৯) এবং আর্টিকেল ১৭ (১৯৪৮)-কে নারীর সমানাধিকার বাস্তবায়নের আন্তর্জাতিক উদ্যোগ হিসাবে মাইলফলক বিবেচনা করা হয়। রুয়ান্ডার পার্লামেন্টে ৬৪ ভাগ নারীর সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ দেশটির গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বণ্টন হিসাবে দেখা হয়। সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসনের পদক্ষেপ হিসাবে দেশটি বিশেষভাবে আলোচিত।

ভারতের নারীদের উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তিতে সমানাধিকারের বিষয়টি নিকটতম প্রতিবেশি বাংলাদেশে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার কারণে। বাংলাদেশের হিন্দু

নারীর সম্পত্তিতে কোনরকম উত্তরাধিকার নেই, এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়াই স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত স্ত্রীর দ্বিতীয় বিয়ের সুযোগও সমাজের বিবেচনা স্বাপেক্ষ। বর্তমান সময়ে নানা কারণে মুসলিম দেশসমূহে আলোচিত এক মুসলিম নেতৃত্বদানকারী এবং এখনও মুসলিম প্রধান তুর্কি দেশটি অর্ধশতাধিক ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের দেশ হওয়া সত্ত্বেও সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত করেছে।

যে সকল দেশ সমানাধিকার বিষয়ক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেসব দেশ শিক্ষা, সমৃদ্ধি ও মানবিক মর্যাদায় এগিয়ে যাবে নিসন্দেহে। যার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, নরওয়েসহ যেসব দেশ কল্যাণরাষ্ট্র হয়ে ওঠতে সক্ষম হয়েছে।

অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা মানুষের ভিন্ন কোন দেশে বসবাসের সুযোগ এলেই উন্নত দেশসমূহে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু তাদের উন্নত দেশ হওয়ার পেছনে যে মানবিক মর্যাদার লড়াইয়ের ইতিহাস, উন্নত দেশ হিসাবে নিজেদের উত্তরণের জন্য শতভাগ নাগরিক সম-মর্যাদার বন্দোবস্ত, সেসব প্রশ্নে আমাদের পরিপার্শ্বে হিরণ্ময় নীরবতা অথবা বিরোধিতাই প্রবল হয়ে ওঠে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, কোন স্বাধীন আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্রকাঠামো ধর্মনিরপেক্ষ আইনী সংস্কার ছাড়া গঠন করা সম্ভব হয়নি। কোন দেশ তার অর্ধেক জনসংখ্যাকে উপেক্ষা করে, অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সুস্থ সমৃদ্ধ দেশ হয়ে ওঠতে পারে না।

লেখক: রাজনৈতিক কর্মী

নারী-পুরুষ বৈষম্যের উৎস সন্ধান

মমিন আফ্রাদ

চার্টার্ড একাউন্টেন্সি পড়তে গিয়ে স্মার্ট শব্দের ইলাবোরেশন সম্পর্কে আমার প্রথম ধারণা জন্মে। আমাদের শিক্ষক ও সিনিয়ররা সবর্দা স্মার্ট হওয়ার প্রেরণা দিতেন।

এখানে,
SMART-এর

S for Specific
M for Measures
A for Attainable
R for Relevant
T for Time Bound

অর্থাৎ
লক্ষ্য হতে হবে সুনির্দিষ্ট,
লক্ষ্যের থাকতে হবে পরিমাপযোগ্য আউটকাম,
লক্ষ্যের থাকতে হবে বাস্তবসম্মত অর্জনযোগ্যতা,
লক্ষ্য হতে হবে প্রাসঙ্গিক এবং
লক্ষ্যের থাকবে টাইমলাইন।

এই বিষয়গুলো আবার মনে পড়ল। কারণ বাংলাদেশ সরকার কয়েক বছর আগে স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ প্রকল্প নিয়েছিল। এই স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি ছিল ৪ টি–

১. স্মার্ট সিটিজেন
২. স্মার্ট গভর্নমেন্ট
৩. স্মার্ট ইকোনমি
৪. স্মার্ট সোসাইটি

তাদের স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সোসাইটিতে নারীর অবস্থান কোথায়?

উত্তরাধিকার আইনে এখনও সনাতন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের কন্যাদের পিতার সম্পত্তিতে কোন হিস্যা নেই স্বাভাবিক পন্থায়। এখনও উত্তরাধিকারের বেলায় মুসলিম পারিবারিক আইনে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার অর্ধেক। আইনগত দিক হতে মুসলিম মেয়েরা কাগজপত্রে যেসব অধিকার পেয়ে থাকেন, সামাজিকভাবে দুর্বল হবার কারণে ততটুকুও তারা বাস্তবায়ন করতে পারেন না।

২০৪১ সালের মধ্যে দেশে কর্মক্ষেত্রসহ সব অবস্থানে নারী-পুরুষের সমতার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০২৩ সালের বাজেটে। এজন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য কমাতে বাজেটে 'জেন্ডার বাজেট'-এর আকারও বাড়ানো হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০৪ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দ ছিল ২ লাখ ২৯ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩২ হাজার ১১০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৭ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ মোট বাজেটের ৩৪.৩৭% টাকা নারী উন্নয়নে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সরকারের ৪৪ টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর অনুকূলে এ বরাদ্দ দেওয়া হয়। (**তথ্যসূত্র:** বণিকবার্তা, ১৩ জুন ২০২৩, এবং জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২৩-২৪) সামনের বছরগুলোতেও হয়তো দেখবো প্রতিবছর 'জেন্ডার বাজেট' বাড়ানো হবে। কিন্তু এতে সরকারকে বহির্বিশ্বে নারী বান্ধব (ফেইক) দেখানো ছাড়া নারীদের কোন ফায়দা হবে কি?

উপরের তথ্যগুলো পড়ার পর নারীদের নিয়ে একটু-আধটু ভাবেন এমন যে কারোরই মন ভালো হয়ে যাওয়ার কথা। আমারও হয়েছিল। কিন্তু 'জেন্ডার বাজেট' নিয়ে বিস্তারিত জানতে পত্রিকা ঘাটাঘাটি করে বেশ কয়েকটি লেখা, মতামত পড়ার পর মনটা চুপসে গেল। 'জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ ও নারীর ক্ষমতায়ন' শিরোনামে প্রতিবছর বৈশ্বিক লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সরকারের বাজেটে নারীর জন্য কতটা বরাদ্দ রাখা হয় এবং নারীর সার্বিক উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ যুক্ত করা হয়েছে তা নির্ধারণ করে সরকার কতটা নারী-বান্ধব এবং সরকারের কার্যক্রম কতটা জেন্ডার রেসপন্সিভ, তার একটা আমলনামা হল এই প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশ ১৪৬ টি দেশের মধ্যে ৭১তম হয়েছিল। (**তথ্যসূত্র:** জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২৩-২৪, পৃষ্ঠা নম্বর ৭৮) মূলত এই জন্যই বাজেটে 'জেন্ডার বাজেট' নামে গালভরা বিরাট অঙ্কের বরাদ্দ দেখিয়ে দেওয়া হয়। সুনির্দিষ্ট তেমন কোন প্রকল্প, লক্ষ্য, পরিকল্পনা, কর্মসূচি থাকে না সেজন্য। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন:

"জেন্ডার বাজেট থাকায় লিঙ্গসমতার বিষয়টি আলোচনায় থাকে। এটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এতদিন ধরে চলে আসা জেন্ডার বাজেটে নিঃসন্দেহে কিছু বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে। তবে আমরা যদি লিঙ্গসমতা চাই, তাহলে এটিকে মূলধারায় নিয়ে এসে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি কাজের মূল্যায়ন করতে হবে।"

অর্থাৎ স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের অভিপ্রায়ে দেওয়া ২০২৩-২০২৪ সালের 'স্মার্ট' বাজেটের পাতায় জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং স্মার্ট কোন কিছুরই উল্লেখ ছিল না। নারীর কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ ও

সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে টুকটাক নামকাওয়াস্তে, লোকদেখানো কিছু কর্মসূচি ছিল অবশ্য। অথচ স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট সোসাইটি গড়ে তুলবে যে স্মার্ট সিটিজেন তাদের প্রায় অর্ধেক সিটিজেন নারীর অবস্থান সোসাইটির যে স্তরে পড়ে আছে, সেখান থেকে তাদের উঠিয়ে নিয়ে আসতে যেরকম নীতিমালা ও পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন, সেসবের কোন উপস্থিতি থাকে না জেন্ডার বাজেটে। এখন আসুন বর্তমান সমাজে, পরিবারে নারীদের অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে কতগুলো কেইস স্টাডি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি।

কেইস স্টাডি: ১

হাজেরা খাতুন একজন আশির্ধ্বো বয়স্কা মহিলা। উনার পাঁচ মেয়ে, দুই ছেলে। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি স্বামীর সাথে স্বামীর বাড়িতে দুই পুত্র ও পুত্রবধূ সমেত বসবাস করছেন। হাজেরা খাতুনরা দুই ভাই ও এক বোন। উনার পিতা ও মাতা ইন্তেকাল করেছেন বহু বছর পূর্বে। এখন উনার পিতার দুই কোটি টাকার সম্পদ হতে আট লক্ষ টাকা উনাকে সেটেলমেন্ট হিসাবে অফার করা হচ্ছে। অথচ উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী উনার পাওয়ার কথা ছিল চল্লিশ লক্ষ টাকা। এখন উনার ছেলেমেয়েরা মনে করছেন মামলায় গেলে হয়তো টাকা বেশি পাওয়া যাবে, কিন্তু ঝামেলাও হবে বিস্তর। এবং মামার বাড়ির সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক তিক্ততায় চলে যাবে। হয়তো সারা জীবনের জন্য সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। তাই উনারা দশ লাখ টাকায় সেটেল করতে রাজি আছেন।

কেইস স্টাডি: ২

নাফিদা আহমেদ একজন পিতা-মাতাহীন ডিভোর্সি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা। উনার এক মেয়ে ও এক বড় ভাই রয়েছে। আফটার ডিভোর্স উনি যখন উনার বাবার বাড়িতে উঠতে যান, তখন উনাকে ভাইয়ের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি ডিভোর্সি বলে উনার চরিত্রের উপর কালিমা লেপনের চেষ্টায় গুজব রটানো হয়। এসবের ভেতর টিকতে না পেরে উনি শহরে মেয়েকে নিয়ে ভাড়া থাকতে বাধ্য হোন।

কেইস স্টাডি: ৩

সালমা বেগমরা চার বোন এক ভাই। পৌরসভার মধ্যে প্রায় চল্লিশ বিঘা জমি রেখে মারা যান সালমা বেগমের পিতা আব্দুল হাই মুন্সি। পিতার মৃত্যুর পর একমাত্র ভাই বিভিন্ন উছিলা দিয়ে নামমাত্র মূল্যে একের পর এক জমি বিক্রি করতে থাকেন। এক সময় নিজের সম্পত্তি বিক্রি শেষ করে বোনদের সম্পত্তিতে হাত পড়ে তার। তখন সালমা বেগমের স্বামী স্ত্রীর গুণধর ভাইকে অবশিষ্ট সম্পত্তি যে বোনদের, সে কথা কেবল স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। ব্যস, এইটুকুই। এরপর জমি বিক্রিতে বাধা দিতে যাননি কখনও। ফলাফল হল সালমা বেগম অসুস্থ হয়ে কয়েক বছর ঘরবন্দী ছিলেন। বারবার খবর দেওয়ার পরও ভাই একটিবারের জন্যও বোনকে দেখতে আসেনি। এমনকি মৃত্যুর পরেও জানাজায় আসেনি।

কেইস স্টাডি: ৪

বেবি সরকার। বাবার বাড়ি চট্টগ্রামে। বিয়ে দেওয়া হয় মদখোর, গাঁজাখোর এক পাত্রের সাথে। বিয়ের পর যৌতুকের জন্য স্বামী ও তার বাড়ির লোকজন নানাভাবে অত্যাচার করতো। শত

অত্যাচার সহ্য করে হলেও স্বামীর বাড়িতে থেকে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে সন্তানসহ বাড়ি থেকে বের করে দেয় বেবি সরকারকে। পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার না থাকায় স্বামীগৃহ থেকে বিতাড়িত বোনকে দাদা-বৌদিও আশ্রয় দেননি। নিরুপায় হয়ে তিনি চট্টগ্রাম শহরে এসে কারখানায় কাজ নেন। কয়েক বছর পর ক্যান্সার ধরা পড়ায় অসুস্থ বেবি সরকার কাজ হারিয়ে ভিক্ষার পথ বেছে নেন।

জেন্ডার ডিস্ক্রিমিনেশনের প্রথম ও প্রধান উৎসই হল পিতার সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকারহীনতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অর্ধেক উত্তরাধিকার। শুধুমাত্র লৈঙ্গিক কারণে পুরুষ জন্মমাত্রই ক্ষেত্রবিশেষে লাখ কিংবা কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়। অথচ বৈধ উপায়ে একই পরিমাণ সম্পত্তির প্রকৃত মালিক হতে একই পরিবারে জন্ম নেওয়া একজন মেয়েকে সারা জীবনের কঠোর শ্রম, মেধা, অধ্যবসায় বিনিয়োগ করতে হয়। ২০২৩ সালের ১৭ এপ্রিলে প্রকাশিত দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার তথ্য বলছে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৯৬% জমির মালিকানা পুরুষের আর মাত্র ৪%-এর মালিকানা নারীর। অথচ রাইটস অফ ফাদার'স প্রোপার্টির বেলায় সব সরকারই একেবারে নিশ্চুপ।

গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে নতুন বাস্তবতায় নতুন স্বপ্ন নতুন আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়েছে নাগরিক মানসে। নারীদের মধ্যেও জন্ম নিয়েছে বৈষম্য বিলোপের আকাঙ্ক্ষা। নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং পরবর্তীতে যারাই সরকার গঠন করবেন, তারা গণ-অভ্যুত্থানে নারীর অংশগ্রহণ ও অবদানকে কীভাবে স্বীকৃতি দেন তা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি।

লেখক: কবি ও সম্পাদক

২০২৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর 'নারী অঙ্গন' পোর্টালে প্রকাশিত লেখাটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ছাপানো হল

সমতার সাংবিধানিক অঙ্গীকার
এবং
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দ্বিচারী চরিত্র

নোরা আহমেদ

"নারীর সম-অধিকার, সম-সুযোগ
এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ।"

এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারা দেশে যখন ২০২৪ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবস মহাসমারোহের সাথে উদযাপিত হচ্ছিল, তা দেখে কেবল 'গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া' প্রবাদ-প্রবচনটির কথা বারবার মনে পড়ছিল! যেমন মনে পড়ে মেয়েদের মায়ের জাত-দেবী-দশভূজা-হোম মিনিস্টার-কল্যাণী-সাবিত্রী-সর্বংসহা ইত্যাদি ইত্যাদি অভিধায় অভিষিক্ত হতে দেখলে! নারীর প্রতি রাষ্ট্র-সরকার-পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তব জীবনে আইনী প্রাপ্য মেটানোর অনীহা দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না এই সবের পিছনের আসল উদ্দেশ্য কী! প্রকৃতপক্ষে এই সবই হল গাছকে মাটি থেকে মূলসহ উপড়ে ফেলে ফাঁকি দেওয়ার জন্য গাছের ডালে ও পাতায় জল দেওয়া অর্থাৎ পরিচর্যা চালিয়ে যাওয়ার মতোই অনেকটা। যেন আমাদের থেকে বাস্তবতা ও প্রকৃত সত্য আড়াল করা যায়! সেজন্য ক্ষেত্রবিশেষে নারীর অসহায়ত্ব, ভীরুতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, পরনির্ভরতা, ঈর্ষাকাতরতা ও কর্তাসত্তার অনুপস্থিতি দেখে এই দেবীদেরই আবার সমাজ ভিক্টিম ব্লেইমিং করতে এবং 'মেয়েমানুষ' বলে অভিহিত করতে একমুহূর্ত দেরি করে না! আমরা মেয়েরাও অধিকাংশই এই সব অভিধা শুনে আনন্দে বাক-বাকুম করে ওঠি প্রায়শই এবং নিজেদের এসবই ভাবতে থাকি! ভাবতে থাকি আমরা তো 'মেয়েমানুষ'। অথচ এসবের পিছনের রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য কম জনই ধরতে পারি এবং বুঝতে পারি।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমতার কথা বারবার ঘোষিত হয়েছে। স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সমান মর্যাদা, অধিকার ও সুযোগের। শুধু তা-ই না, হাজার হাজার বছরের বঞ্চনার শিকার নারীদের সমাজের মূলধারায় যুক্ত করতে, ফিরিয়ে

আনতে ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ বিশেষ সুযোগের ও অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। সংবিধানে নারীর অধিকার, সমতা ও সুযোগ সম্পর্কিত কয়েকটি ধারার কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়–

অনুচ্ছেদ ২৭, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।"

অনুচ্ছেদ ২৮ (১), "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।"

অনুচ্ছেদ ২৮ (২), "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।"

অনুচ্ছেদ ২৮ (৪), "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

অনুচ্ছেদ ২৯ (১), "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।"

অনুচ্ছেদ ২৯ (২), "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবে না, কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হইবে না।"

অনুচ্ছেদ ৬৫ (৩)-এ জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। সেজন্য নারীর জন্য ৫০ টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৫৯ অনুযায়ী স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

সংবিধানের তৃতীয় ভাগের (মৌলিক অধিকার) ২৬ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করিবে না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"

নারীর সমানাধিকার, বিশেষাধিকারের সাংবিধানিক আইনী স্বীকৃতি থাকলেও বাস্তব জীবনে আমরা কী দেখতে পাই? দেখতে পাই, এসবের বেশিরভাগই কাগুজে সান্ত্বনা মাত্র! মাইটোকন্ড্রিয়া যদি জীব কোষের শক্তির প্রাণকেন্দ্র বা আধার হয়ে থাকে, পিতার সম্পত্তিতে সন্তানের অধিকারের স্বীকৃতি এবং অধিকারের প্রতিষ্ঠা লাভ বাদবাকি অধিকার আদায় করে নেওয়ার শক্তির প্রধান উৎস, প্রধান শর্ত। ব্যক্তির অধিকারের এই মূল জায়গাটাতেই ধর্মের দোহাই দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নারীদের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার অধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে বাইরে রাখা হয়েছে। অপরদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীদের পুত্র সন্তানের অর্ধেক অংশীদার করার মধ্য

দিয়ে প্রকারান্তরে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করার বাস্তব, সামাজিক, পারিবারিক, মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

পিতার সম্পত্তিতে যখনই কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের সম-অংশীদার করার অধিকার প্রসঙ্গে দাবি উত্থাপন করা হয় তখনই ধর্মগুরু থেকে শুরু করে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সব শ্রেণি-পেশার লোকই ধর্ম গেল, সমাজ গেল বলে শোরগোল তোলে। এক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ কোন সম্প্রদায়ই কেউ কারও চেয়ে কম যান না! তারা এমন সব যুক্তি দেখান, যেন-বা ধর্ম-সমাজ-পরিবার-জগৎ-সংসারের যাবতীয় কিছুর টিকে থাকাই নির্ভর করছে কন্যা সন্তানকে পিতার সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উপর।

হিন্দুপ্রথা ও বাংলাদেশের আইন অনুসারে পিতা-মাতা মারা গেলে পিতার সম্পত্তি শুধু ভাইয়েরাই পায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানের উপস্থিতিতে সম্পত্তির অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। পুত্র সন্তান না থাকলে অবিবাহিতা কন্যা এবং পুত্রবতী কন্যারা জীবনস্বত্বে সম্পত্তির অধিকার পায়। অন্যদিকে বন্ধ্যা, বিবাহিতা কন্যা, বিধবা কন্যা এবং কন্যা সন্তান জন্মদানকারী কন্যারা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ কন্যা সন্তানের অধিকার নির্ভর করে তার পুত্র থাকা বা না থাকার উপর। বৌদ্ধ ধর্মের উৎস হিন্দু ধর্ম হওয়ায় এবং বৌদ্ধ ধর্মে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে কোন আলাপ না থাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের উত্তরাধিকার আইন অনুসরণ করা হয়।

বিভিন্ন সংস্থার গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা তৈরি আইন কমিশন প্রদত্ত 'হিন্দু পারিবারিক আইন সংস্কারের সুপারিশ বিষয়ক আইন কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন' বা 'খসড়া হিন্দু উত্তরাধিকার আইন-২০২০' থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তিগুলো হল–

- নানা প্রতিকূল পরিবেশের কারণে মেয়েরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাদের সম্পত্তির অংশ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না এবং সামান্য মূল্যের বিনিময়ে তা প্রভাবশালী বিত্তবান লোকের হাতে চলে যাবে!

- সম্পত্তির লোভে অন্য ধর্মের লোক হিন্দু নারীদের প্রলোভিত করে তাদেরকে সম্প্রদায় ত্যাগ করতে বাধ্য করবে, যার ফলে হিন্দু সমাজ ও সম্পত্তি ধ্বংসের মুখোমুখি হবে!

মুসলিম কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের অর্ধেক অংশীদার করার পিছনে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যেসব যুক্তি দেখিয়ে থাকে তাদের মধ্যে অন্যতম হল, নারীদের অন্য অনেক দিক থেকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়েছে। "তারা তো স্বামীর সম্পত্তির ভাগ পায়!" "তাদের তো দেনমোহর দেয়া হয়"– কাজেই তাদের পিতার নিকট থেকে এত সম্পত্তির দরকার নেই! প্রকারান্তরে তারা যেন বলতে চান, মেয়েদের এত্ত এত্ত দিক থেকে সম্পত্তির অংশীদার করা হয়েছে, তারপরও পিতার সম্পত্তির কী দরকার! ভাবটা এমনই, যেন অন্যান্য দিক থেকে সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার অধিকার শুধু মেয়েদেরই করা হয়েছে, ছেলেদের করা হয়নি! স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান থাকলে স্ত্রী স্বামীর

সম্পত্তির ২ আনা, সন্তান না থাকলে ৪ আনা অংশীদার হোন। অপরদিকে স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্তান থাকলে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির ৪ আনা, সন্তান না থাকলে ৮ আনা সম্পত্তির অংশীদার হোন। অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রী যে কারও মৃত্যু হলে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির যতটুকু ভাগের অধিকারী হোন, স্বামী হোন স্ত্রীর তুলনায় দ্বিগুণ সম্পত্তির অধিকারী। অথচ প্রায়ই যুক্তি হিসাবে নিয়ে আসা হয়, মেয়েরা তো স্বামীর সম্পত্তির ভাগ পায়!

> **পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তির সুযোগ ঘটে দৈবাৎ। কেননা পৈতৃক সম্পত্তি আগের প্রজন্ম থেকে কোন রকম মাধ্যম ছাড়া সরাসরি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরিত হয়। এই প্রাপ্তির সুযোগ ১০০ ভাগ নিশ্চিত। অপরদিকে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্য সম্পত্তির অধিকারের উৎস নিজেরই প্রজন্ম কিংবা পরের প্রজন্ম, যা প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রায় ১০০ ভাগই অনিশ্চিত! সেটা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।**

আর উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েদের ছাড়া অন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে দেনমোহর খুব সামান্যই নির্ধারিত হয়। আর সব ক্ষেত্রেই যা-ও নির্ধারণ করা হয়, সেটাও কদাচিৎ পরিশোধ করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্য অধিকারগুলোর মতো শূন্য বা বকেয়াই থেকে যায় আজীবন! তাছাড়া দেনমোহরের মাধ্যমে অর্থ কিংবা সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকারকে কখনোই সম্মানজনক বলে মনে করা যায় না। এক্ষেত্রে দেনমোহর দিয়ে স্বামীরা সাধারণত মনে করে স্ত্রীকে অর্থের মাধ্যমে কিনে এনেছে! এজন্য অনেক শিক্ষিত, আধুনিক মেয়েই দেনমোহর ছাড়া অর্থাৎ নামমাত্র প্রতীকী দেনমোহরে বিয়ে করেন আজকাল।

বাস্তব জীবনে আমরা কী দেখি? আমরা দেখতে পাই, পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তির সুযোগ ঘটে দৈবাৎ। কেননা পৈতৃক সম্পত্তি আগের প্রজন্ম থেকে কোন রকম মাধ্যম ছাড়া সরাসরি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরিত হয়। এই প্রাপ্তির সুযোগ ১০০ ভাগ নিশ্চিত। অপরদিকে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্য সম্পত্তির অধিকারের উৎস নিজেরই প্রজন্ম কিংবা পরের প্রজন্ম, যা প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রায় ১০০ ভাগই অনিশ্চিত! সেটা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন: ভাই-বোন-পুত্র-কন্যার নিকট থেকে প্রাপ্য সম্পত্তির দাবিদার তখনই হওয়া যায়, ক্ষেত্রবিশেষে শেষ জীবনে তারা গত হলে এবং নিঃসন্তান হলে। তাছাড়া সম্পত্তি সন্তানদের, বিশেষ করে পুত্র সন্তানদের দখলে থাকে বিধায় সেখান থেকে কোন অংশীদারের প্রাপ্য সম্পত্তি বের করে নিয়ে আসা আর এভারেস্ট জয় করা একই বিষয়। এভারেস্ট চূড়া জয় করে অক্ষত দেহে ফিরে আসা যেমন অতিশয় দক্ষতা ও ভাগ্যের ব্যাপার, তেমনি ভাই কিংবা তাদের সন্তানদের নিকট থেকে নিজের সম্পত্তির অংশ বের করে নিয়ে এসে সুস্থ ও স্বাভাবিক পারিবারিক, সামাজিক, আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে পারা অমাবস্যার চাঁদ দেখতে পাওয়ার মতোই অসম্ভব ঘটনা!

এই প্রায় ১০০ ভাগ অনিশ্চিত ক্ষেত্র থেকে সম্পত্তি প্রাপ্তির মুলো দেখিয়ে মেয়েদের ১০০ ভাগ নিশ্চিত ক্ষেত্র থেকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েরা যখনই পিতার সম্পত্তির অধিকার চাইতে যায় তখন এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চোখে তারা হয়ে যায় অবলা, সরলা, নির্বোধ, ছেলে ভোলানো প্রলোভনে আকৃষ্টা। আর নির্ধারিত পৈতৃক সম্পত্তি অর্থাৎ নিজের সম্পত্তির ভাগ আনতে গেলে মুসলিম মেয়েদের লোভী, ছোটলোক, আত্মসম্মানবোধহীন ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়! বলা হয় ভাইয়ের কাছ থেকে সম্পত্তির ভাগ আনতে চাচ্ছে! ভাইয়ের সম্পত্তি আবার কী! ভাই কি নিজের সম্পত্তির ভাগ দেয় নাকি! নিলে ভাইয়ের কাছে রেখে যাওয়া বোন তার নিজের সম্পত্তি নিবে! উল্টো ভাই যে বোনের সম্পত্তি ভোগ দখল করে খাচ্ছে, সেটা যেন কিছু না! আমরা যখনই নিজেদের অধিকার-স্বাধীনতা-কর্তাসত্তা নিয়ে ভয়েস রেইজ করি, হিস্যা দাবি করি–এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাছে তখন আমরা অবলা, সরলা, নির্বোধ, ছেলে ভোলানো গল্পে আকৃষ্টা, লোভী, ছোটলোক, রাতের রাণী, ভ্রষ্টা, নষ্টা, ডাইনি, নারীবাদী, ধর্মবিরোধী, নাস্তিক ইত্যাদি ইত্যাদি হয়ে যাই। আর পুরুষ তখন তাদের কাছে উল্টো হয়ে যায় দায়িত্বশীলতার পরাকাষ্ঠা-মহান-অতি সরল-নির্বোধ-ছেলে ভোলানো গল্পে আকৃষ্ট অতি ভালো-পূত-পবিত্র।

“

সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির মধ্যে কেবল নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই জড়িত না, নারীকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে স্বীকৃতির বিষয়টাও জড়িয়ে রয়েছে। অর্ধেক কিংবা পুরোপুরি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে নারীকে ঊনমানুষ ও নয়-মানুষ বানিয়ে রাখা হয়েছে। যারা নয়-মানুষ, পূর্ণাঙ্গ/সম্পূর্ণ মানুষ না, তাদের শুধু অর্ধেক না, সবটা থেকেই বঞ্চিত করা যায়। তাদের সাথে যা খুশি তা-ই করা যায়, এই ন্যায্যতা তৈরি হয়ে যায়।

মুসলিম পারিবারিক আইনে পিতার সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের অংশীদারত্ব পুত্র সন্তানের অর্ধেক হওয়ার কথা থাকলেও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পুরোটাই কাগুজে বাঘের মতোই। পিতার সম্পত্তির ভাগ চাইতে গেলেই পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধিরা চারদিক থেকে বলা শুরু করে এবং দৃষ্টান্ত খুঁজে নিয়ে আসে সম্পত্তির ভাগ নিলে নাকি ভাইদের অভিশাপ সারা জীবন বহন করতে হবে বোনদের। আর ভাইয়েরাও মনে করে বোনেরা সম্পত্তির ভাগ নিয়ে গেলে ভাই-বোনের সম্পর্ক চর্চার প্রয়োজনীয়তাও চুকিয়ে যায় এবং চুকিয়ে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়। শুধু তা-ই না চুকিয়ে ফেলাও হয় যারা সবকিছু অগ্রাহ্য করে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ চাইতে আসে। একদিকে ‘ভাইদের অভিশাপের মিথ’, সমাজ ও আত্মীয়-পরিজনদের কাছে ‘লোভী’ ও ‘ছোটলোক’ বনে যাওয়া, বাপের বাড়ির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ইত্যাদি মেয়েদের মধ্যে যে আতঙ্ক আর ডিল্যেমার জন্ম দেয়, সারা জীবন তারা সেটা থেকে বের

হতে পারে না সাধারণত। আর মেয়েদের বের হওয়ার মতো করে কর্তাসত্তার বিকাশের সুযোগ, সময়, পরিবেশ, শিক্ষাও দেওয়া হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগির পর যদি ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক শেষ হয়ে না যায়, তাহলে ভাইয়ের সাথে বোনের সম্পর্ক সমাপ্তির এই আতঙ্ক মেয়েদের মনে সচেতনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়ার এবং সম্পর্কচ্ছেদের পিছনে গূঢ় উদ্দেশ্য ও স্বার্থ রয়েছে। সেটা হল সচেতনভাবে বোনদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জমিন তৈরি রাখা। এর ফলে মুসলিম নারী কদাচিৎ বাবার সম্পত্তির ভাগ চাইতে যায়, চাওয়ার সাহস দেখা যায়।

একটা সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক পারিবারিক পরিবেশে বেড়া ওঠা মেয়েও শৈশবেই চারপাশের নানা ঘটনা ও পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে জেনে যায় এবং বুঝতে পারে সে তার ভাইয়ের সমান না। সেটা সম্পত্তির অধিকারের দিক দিয়েও না, আবার জীবনযাপনের দিক দিয়েও না। এই বাস্তবতা মেয়েদের মনস্তত্ত্ব গঠনে বিরাট প্রভাব ফেলে। ফলে শৈশব থেকেই মেয়েরা এক প্রকার অস্তিত্বহীনতার সংকটে ভোগে। এই অস্তিত্বহীনতার সংকট যেটুকু প্রাপ্য অধিকার, সেটুকুও চেয়ে নেওয়ার সাহস নিঃশেষ করে দেয়। বড় কিছুর স্বপ্ন দেখার জন্যও পায়ের তলায় মাটি থাকা লাগে। তাই তাদের জীবনে বড় কোন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কমই থাকে। কোন রকম টিকে থাকাই তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে তাদের চিন্তাও থাকে মূলত বিয়ে-কেন্দ্রিক, স্বামী-কেন্দ্রিক। এমনকি একটা মেয়ে লেখাপড়া শেষ করে ভালো কোন পেশায় গিয়েও সৎভাবে উপার্জন করে জায়গা কিনে, ছোট্ট একটা বাড়ি করতে জীবনের ৪/৫ সময় চলে যায়। অপরদিকে তারই কোন ভাইকে দেখা যাবে, কষ্ট করে পড়াশোনা করে চাকরি কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াই জন্মের পরপরই এরচেয়ে কয়েক গুণ বেশি সম্পত্তির অধিকারী হয়ে গিয়েছে শুধু ছেলে বলে। দেশের ৯৬% জমির মালিক পুরুষ, এই নির্মম সত্যটাই আমাদের সামনে নিয়ে আসে। এই একুশ শতকেও এই বৈষম্য চূড়ান্ত মাত্রায় অন্যায়, গর্হিত অপরাধ। শুধু তা-ই না, নারীর মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনও।

সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির মধ্যে কেবল নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই জড়িত না, নারীকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে স্বীকৃতির বিষয়টাও জড়িয়ে রয়েছে। অর্ধেক কিংবা পুরোপুরি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে নারীকে ঊনমানুষ ও নয়-মানুষ বানিয়ে রাখা হয়েছে। যারা নয়-মানুষ, পূর্ণাঙ্গ/সম্পূর্ণ মানুষ না, তাদের শুধু অর্ধেক না, সবটা থেকেই বঞ্চিত করা যায়। তাদের সাথে যা খুশি তা-ই করা যায়, এই ন্যায্যতা তৈরি হয়ে যায়। এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ন্যায্যতা তৈরি হয়ে এসেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর তার চিতায় তারই কয়েক শত সুস্থ, সবল, জীবিত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে দুশো বছর আগেও। শুধুমাত্র সন্তান কিংবা পুত্র সন্তান জন্ম দিতে না পারায় আজও স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয়, কিংবা বিয়ে করে নতুন স্ত্রী ঘরে নিয়ে আসা হয়।

বাংলাদেশের মেয়েদের বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাদের এই আশ্রয়হীনতা, সম্পত্তিহীনতার সুযোগ ভালোভাবেই নেয়। তারা জানে যতই অপমান-অসম্মান, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করা হউক না কেন, কর্মহীন ও উপার্জনহীন গৃহবধূটির এসব নির্যাতন সহ্য করে শ্বশুরবাড়িতে থেকে যাওয়া ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় অপশন খোলা নেই। বাবা-ভাইও পাত্রস্থ করার মধ্য দিয়ে যে দায়িত্ব শেষ করে দিয়েছিলেন, পুনরায় সে দায়িত্ব কাঁধে নিতে চান না। বাড়তি বোঝা বলে মনে করেন। বাপের বাড়িতে ফিরে গেলেও সেখানে তাদের জন্য অধিকারহীন আরেক পরজীবীর জীবন অপেক্ষা করে থাকে।

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের বাত, আথ্রাইটিস, স্পোর্টস ইনজুরি ও পক্ষাঘাত রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. মনিরুল ইসলাম মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আলাপকালে কথা প্রসঙ্গে জানান, নারীদের নিজেদের কাছে অর্থ-সম্পত্তি না থাকায় অনেক সামর্থ্যবান স্বামীও স্ত্রীর দীর্ঘমেয়াদি রোগের চিকিৎসার খরচ বহন করতে চান না। নানান অজুহাতে মাঝপথে চিকিৎসা বন্ধ করে দেন। অথচ মেয়েরা যদি ভাইদের মতো পিতার সম্পত্তির ভাগ পেত, তাহলে শ্বশুরবাড়িতে তাদের কদর থাকতো। আর কোন কারণে নির্যাতনের শিকার হলে, সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলেও নতুনভাবে জীবন শুরু করার এবং জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার রসদের অভাবে পড়তে হতো না। অসহায়ের মতো শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করা, আত্মহত্যাকে বেছে নেওয়া কিংবা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে দুই দিন পরপর পত্রিকার শিরোনাম হতে হতো না আমাদের বোনদের! একদিকে পড়াশোনার মাধ্যমে বোধ-বুদ্ধি তৈরি এবং সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির সময়-সুযোগ না দিয়ে বিয়ে দিয়ে এবং অপরদিকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে নারীদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাতারে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

> **পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অংশীদারত্ব শৈশবেই কন্যাশিশুর ভাবজগতকে আমূল বদলে দিবে। তাদের স্বপ্ন, লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, জীবনবোধকেও প্রভাবিত করবে। আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিবে। পরজীবী না হয়ে সংগ্রামী জীবন বেছে নিতে উজ্জীবিত করবে।**

অনেকে বলতে পারেন এবং বলেনও, "আইন দিয়ে কী হবে?" বর্তমান জমানায় আইনগত ভিত্তি অবশ্যই অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি এবং প্রথম শর্ত। আইনগত ভিত্তি না থাকলে অধিকার প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, দাবিই তো তোলা যায় না। পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের সম-অংশীদারত্ব না থাকায় যেসব পরিবারে কেবল কন্যা সন্তান থাকে অর্থাৎ কোন পুত্র সন্তান থাকে না, সেরকম প্রায় প্রতিটি পরিবারে এক অনন্ত যুদ্ধ চালু হয়ে যায় চাচাতো ভাইদের সাথে সম্পত্তি নিয়ে এই আইনগত কারণেই। এক্ষেত্রে চাচা অর্থাৎ চাচাতো ভাইদের আইনগতভাবে সম্পত্তির অংশীদার করায় তারা চায় চাচাতো বোনের সম্পত্তি দখল করে নিতে। অপরদিকে কন্যা সন্তানের পিতা-মাতারা চান, সমস্ত সম্পত্তি নিজের কন্যা সন্তানকে দিয়ে যেতে। পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের সম-অংশীদারত্ব এই পারিবারিক জটিলতার নিরসন করতে পারে। এই আইনগত ভিত্তির কারণেই অসহায়, বন্ধ্যা, নির্যাতিতা, বিধবা হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নারীদের বিয়ের পর ভাইয়ের বাড়িতে স্থান পাবে কি না সেটা একান্তই ভাই-ভাবীর দয়া ও করুণার উপর নির্ভর করে। আর স্থান পেলেও সেটাকে কোন সম্মানজনক স্থান পাওয়া বলে না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। অনেকটা বাড়ির চাকরাণীর মতো স্থান পাওয়া।

পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অংশীদারত্ব শৈশবেই কন্যাশিশুর ভাবজগতকে আমূল বদলে দিবে। তাদের স্বপ্ন, লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, জীবনবোধকেও প্রভাবিত করবে। আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিবে। পরজীবী না হয়ে সংগ্রামী জীবন বেছে নিতে উজ্জীবিত করবে। 'এতো কিছু করে অর্ধেক সম্পত্তি

এনে আর কী হবে', 'এই অর্ধেকও তো দেয়া হবে না, সামান্য কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়ে নেয়া হবে'– এখন এমন মনোভাব কাজ করে সাধারণত। সমান সমান হলে কিন্তু এমনটা কাজ করবে না। আগের মতো সম্পত্তি না দেওয়ার জন্য সকল ফন্দি-ফিকির ব্যর্থ হয়ে যাবে। জন্মের পর কোন মানুষ যখন ভাবতে শিখে সে কারও থেকেই ছোট না, তখন তাকে দমিয়ে রাখা পৃথিবীর কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। সম্পত্তির সম-অংশীদারত্ব কন্যাদের মনে এই বোধটাই জাগিয়ে তুলতে নিয়ামক হিসাবে কাজ করবে। শুধু সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা না, অন্য সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এই বোধ কাজ করবে। এটা নারীদের জীবনবোধ থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপ্তি, উজ্জ্বলতা আমূল বদলে দিবে। তাদের এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে ভূমিকা পালন করবে।

একটা দেশের প্রায় অর্ধেক নাগরিককে কখনও আইনগতভাবে, কখনও প্রায়োগিকভাবে জীবন-স্বাধীনতা-সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং কর্তাসত্তা গড়ে ওঠার পথে অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা রেখে তাদের প্রকৃত বিকাশ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি দেশটাকে একটা ন্যূনতম পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবেও গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই কথা কি প্রায় ৩৫ বছর যাবৎ প্রধান নির্বাহী ক্ষমতায় থাকা নারী প্রধানমন্ত্রীরা তথা দেশের প্রধান নীতি-নির্ধারকরা জানতেন না? অবশ্যই জানতেন। না জানার কথা নয়। এরপরও তারা গন্তব্যে পৌঁছাতে অতি সংক্ষিপ্ত এবং প্রধান রাস্তা বাদ দিয়ে বছরের পর বছর দূরের অলিতে-গলিতে ঘুরপাক খেয়েছেন এবং আমাদেরও খাইয়েছেন। এবং গাছের গোড়া কেটে দিয়ে আগায় জল দিয়ে গিয়েছেন!

দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪) সেই ১৭ শতকেই অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় চারশত বছর আগে জানান দিয়ে গিয়েছেন মানুষের ৩ টি প্রাকৃতিক তথা জন্মগত অধিকারের কথা– জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি (Life, Liberty and Property) এবং নাগরিকদের এইসব জন্মগতভাবে পাওয়া অধিকারের সুরক্ষা দিতে রাষ্ট্র যে নৈতিকভাবে বাধ্য সে কথা। নিজেদের সভ্য বলে দাবি করা পুঁজিবাদী দেশগুলোও বহু আগেই তাদের নাগরিকদের জন্মগতভাবে পাওয়া এসব অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বাস্তব জীবনে কার্যকর করেছে।

এই লক্ষ্যেই জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার আইন ঘোষণা করেছে। ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women বা সংক্ষেপে সিডও (CEDAW) সনদ গৃহীত হয়। নারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিল অফ রাইটস বলে চিহ্নিত এ দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড বলে বিবেচিত হয় পুঁজিবাদী দুনিয়ায়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে সিডও সনদে স্বাক্ষর করে। কিন্তু সিডও সনদে বাংলাদেশ অনুমোদন করলেও তা পরিপূর্ণভাবে করেনি। বাংলাদেশ সরকার শুরুতে সিডও সনদের ধারা-২, ১৩ (ক), ১৬.১ (গ) ও (চ) ধারাগুলোয় আপত্তি জানিয়ে তা অনুমোদন করেনি। পরবর্তী সময়ে সরকার ১৩ (ক), ১৬.১ (চ) অনুচ্ছেদ থেকে আপত্তি তুলে নেয়। বাকি ২ টি ধারা থেকে আপত্তি তুলে নেয়নি এবং অনুমোদন করেনি আজও।

বাংলাদেশ সরকারের আপত্তি দেওয়া ২ টি ধারার মধ্যে ধারা ২-এ বৈষম্য বিলোপ করে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপনের জন্য নীতিমালা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। প্রতিটি দেশের জাতীয় সংবিধান, আইন-কানুন ও নীতিমালায় নারী ও পুরুষের সমতার নীতিমালা সংযুক্তকরণ ও তার প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন-কানুন, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার নিষিদ্ধ করার কথা। সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা। এজন্য আদালত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীকে সব ধরনের বৈষম্য থেকে রক্ষা করা এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন রোধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে।

ধারা ১৬.১ (গ)-এ বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে নারী ও পুরুষের একই অধিকার ও দায়-দায়িত্ব নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। সরকার বর্তমানে প্রচলিত আইনগুলোর পর্যালোচনা করবে এবং একটি সর্বজনীন পারিবারিক আইন চালু করবে, যা সব ধর্ম ও বিশ্বাসের লোকদের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য হবে। এতে বিয়ে এবং তালাকের সময় সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করবে। সরকার নারী উন্নয়ন নীতিমালা-১১, জাতীয় বাজেট ইত্যাদিতে নারীদের জন্য হ্যান করেঙ্গে ত্যান করেঙ্গে বলে কথামালার পর কথামালা গেঁথে গিয়েছে। কিন্তু সিডও সনদের ধারা ২ ও ধারা ১৬.১ (গ)– এই দুটি ধারার মধ্যে যে নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রাণভোমরা লুকিয়ে রয়েছে, সেখানে এসে কবি নীরব! এই দুটি ধারা অনুমোদন ও কার্যকর করা না হলে আগামী ৫ শত বছরেও পুঁজিবাদী দুনিয়ায় নারী উন্নয়ন ও নারী-পুরুষ সমতার যে মানদণ্ড রয়েছে, তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। শুধু তা-ই না, এ ২ টি ধারা কার্যকর না করে নারীকে পুরুষের সাথে সমানতালে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাগিদ দেওয়া আর হাত-পা বেঁধে উত্তাল নদী পাড়ি দেওয়ার জন্য বলা একই কথা। এটা শুধু নারীর সাথে মশকরা না, চূড়ান্ত মাত্রায় প্রতারণাও।

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক এই স্বাধীন-সার্বভৌম-গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটানো হয়েছিল সকল প্রকার অসমতা, অন্যায্যতা, বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে' (স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র)। সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদেও সমতার অঙ্গীকার করা হয়েছে (২৭ অনুচ্ছেদ)। এবং রাষ্ট্রের কোন আইন সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে যেটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সেটুকু বাতিল বলে গণ্য করার অঙ্গীকার করা হয়েছে (২৬-এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)।

রুশোর মতে, আমাদের প্রত্যেকটি স্বাধীন কার্যই ২ টি শক্তির সম্মিলনে সম্পাদিত হয়।
১. নৈতিক/ নীতিগত/ ইচ্ছা/ ইচ্ছাশক্তি ও
২. দৈহিক শক্তি।

দৈহিক শক্তি নীতিগত বা ইচ্ছাশক্তিকে কার্যে পরিণত করে। তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, যখন কেউ হাঁটতে শুরু করে তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হয়, সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন স্থানে বা লক্ষ্যবস্তুর কাছে পৌঁছাতে চায়। বস্তু/ স্থানটির কাছে যাওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে

বা স্থানে পৌঁছে দেওয়ার মতো শক্তি দুটি পায়ের আছে কি না? একজন পঙ্গু ব্যক্তির মানসিক ইচ্ছে হতে পারে দৌড়ে যাওয়ার। আবার একজন সুস্থ মানুষের দৌড়াবার ইচ্ছে না-ও থাকতে পারে। বাস্তবে দুজনার ক্ষেত্রেই ফল একটিই। তারা উভয়েই একই স্থানে অবস্থান করবে। তাদের কারোরই অবস্থানগত কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

রাষ্ট্রসংস্থার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই। একটি রাষ্ট্র তার নাগরিকদের আচরণ ও তাদের মানসকে কীভাবে গড়ে তুলতে চায়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন দেখতে চায়, সে সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সিদ্ধান্ত নিতে হয় নাগরিক তার সহ-নাগরিকের সাথে কেমন আচরণ প্রদর্শন করবে এবং সেইভাবে তাদের গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নিতে হয়। নারীর অবস্থা, অবস্থান, পড়াশোনা, অধিকার, পোশাকের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নারী-পুরুষ সম্পর্কে নারীর অবস্থান কেমন হবে সে সম্পর্কেও আগে প্রতিটি রাষ্ট্রকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেজন্য নীতি নির্ধারণ করে কর্মসূচি ও প্রকল্প হাতে নিতে হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রের রিপ্রেসিভ (পুলিশ, আদালত, সেনাবাহিনী ইত্যাদি) ও আইডিওলজিক্যাল (আইন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, সিনেমা, নাটক, সংস্কৃতি ইত্যাদি) স্টেট অ্যাপারেটাসগুলোকে সেসব নীতি, কর্মসূচি, প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজে লাগানো হয়। অর্থাৎ নারীর উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রথম বিনিয়োগটা বাংলাদেশ রাষ্ট্রকেই করতে হবে।

১৯৬১ সালে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন থেকে না-শরীকের ধারা বাতিল করায় কত শত এতিম সন্তানের দীর্ঘশ্বাস যে রোধ করা গিয়েছে, আমাদের আশেপাশে একটু দৃষ্টি দিলেই দেখতে পাবো। বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে তার দ্বিমুখী ভূমিকা থেকে বেরিয়ে এসে নারীর পক্ষে তথা নারীকে এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে অবস্থান নিবে কি না এবং সে অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করে কর্মসূচি নিবে কি না? না নারীবিরোধী, পিতৃতান্ত্রিকদের পক্ষেই তার অবস্থান জারি রাখবে? গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে নতুন করে সংবিধান প্রণয়নের জন্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে নারী বিষয়ক কমিশনও। আমরা প্রত্যাশা করি, নতুন সংবিধানে কেবল ছেলে ভোলানো সমতার বাণী আমাদের না শুনিয়ে আলাদা অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে সমান উত্তরাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণ করে দেওয়া হবে।

যদি জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশেও নারীবিরোধীদের পক্ষেই রাষ্ট্র তার অবস্থান জারি রাখে তাহলে দেশের নারী সমাজকেও ভেবে দেখতে হবে, এই দ্বিচারী ও পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে তাদের সম্মতি অবিরত দিয়ে যাবেন কি না?

লেখক: নারী অধিকার কর্মী

২০২৪ সালের ২৬ এপ্রিল 'নারী অঙ্গন' পোর্টালে প্রকাশিত লেখাটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ছাপানো হল

নারীর মর্যাদা, সম্পত্তি বণ্টন এবং আরব ঐতিহ্য থেকে বৈশ্বিক মূল্যবোধ বিবেচনা

মোকাররম হোসেন

'সম্পত্তি বণ্টনে সমানাধিকার কোরানে নেই'– এই দাবি যারা করেন তারা আসলে কোরান, শরীয়া, আইন ইত্যাকার বিষয়াদির স্থান-কাল সম্পর্ক আমলে নেওয়া জরুরি বলে মনে করেন না বা সেটা যে জরুরি তা জানেন না। কোরান অবশ্যই সেই সময়কার আরবের গোত্রবাদী সমাজে একটা বৈপ্লবিক ঘটনা ছিল। কিন্তু বৈপ্লবিক প্রস্তাবনারও একটা সীমা আছে, সীমা থাকে। ইতিহাসের একটা কালপর্বে, একটা ভৌগোলিক পাটাতনে, একটা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে কতদূর অগ্রসর হয়ে বিধান নাজেল হলে বা আইন রচিত হলে সেটা বাস্তব ও প্রায়োগিক হবে সেই বিবেচনা থাকে।

উদাহরণ হিসাবে আমরা দাস ব্যবস্থা আমলে নিতে পারি। আমাদের কালে দাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ। কিন্তু কেউ কি বলে দাস ব্যবস্থার নিষিদ্ধতা কোরানে নেই, তাই এটা কোরান বিরোধী? বলে না। কারণ সভ্যতার অগ্রসরমানতা আমাদের মানবিক মর্যাদার এমন একটা বোধ দেয় যে আমরা দাস ব্যবস্থাকে অমানবিক সাব্যস্ত করেছি। প্রশ্ন হতে পারে ইসলামে মানবিক মর্যাদার ধারণা কি অতটা অগ্রসর ছিল না, যার কারণে দাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হয়নি? ইসলাম সেই কালে মানুষের মর্যাদা বৈপ্লবিকভাবে বহুদূর অগ্রসর করেছে। দাসদের মানুষের মর্যাদা দিয়েছে। দাসদের অত্যাচার নিষিদ্ধ করেছে। দাসদের প্রয়োজনীয় খাবার, পোশাক ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে বলেছে। সেই কারণেই ইসলামের শুরুর দিকে বিপুল সংখ্যক দাস ইসলাম কবুল করেছে। তবু কেন ইসলামে দাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হয়নি এই প্রশ্ন হাজির হয়। সেই কালের সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে দাস নির্ভর ছিল। ফলে সেই সময় দাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধকরণ অপ্রায়োগিক ও অবাস্তব হতো।

ইসলাম সেই কালে একটা সর্বোচ্চ ভালো ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছে মানব সভ্যতার জন্য। কিন্তু অনাগত কালের মানব সভ্যতার রূপান্তরে আইনকে এগিয়ে নেওয়া বর্তমান ও ভাবী কালের মানুষের দায়িত্ব। যতক্ষণ না ইসলামের বিপক্ষে এবং ইসলামের মর্মের সাথে অসামঞ্জস্য থাকে। মানুষ দাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছে।

কারণ মানবজাতির সামগ্রিক বোঝাপড়া (কালেক্টিভ কনসাসনেস) দাস ব্যবস্থার বিপক্ষে। একইভাবে দাসীদের সাথে যৌনতা অনুমোদনের বিপক্ষে। হাটে-বাজারে মানুষ কেনা-বেচার বিপক্ষে। শাস্তি হিসাবে শরীরী অঙ্গচ্ছেদের বিপক্ষে। মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে সভ্যতার বোঝাপড়া এগিয়ে চলেছে। এসব কিছু ধর্মের প্রতিপক্ষ না। বরং ধর্মের বৃহত্তর উদ্দেশ্যকেই এগিয়ে নেওয়া।

এবার আসি সম্পত্তি বণ্টনে সমানাধিকার বিষয়ে। কোরানে সম্পত্তি বণ্টনের যে বিধান আছে এটার ঐতিহাসিক সম্পর্ক কেমন? এটার ভৌগোলিক বাস্তবতা কেমন? এটার সামাজিক প্রেক্ষিত কেমন? কোরান নাজেলের কালে আরবের সমাজ ব্যবস্থার দুটো অভিমুখ বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত গোত্রবাদী সমাজ ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থা। সম্পত্তি বণ্টন কেবল একটা পরিবারের সন্তানদের মধ্যকার ঘটনা না। সম্পত্তি একইসাথে গোত্রের সংহতির সাথে সম্পর্কিত। গোত্রের সামষ্টিক সম্পদের পরিমাণ গোত্রের ভেতরকার সদস্যদের মধ্যেই থাকবে। বিশেষ করে জমি। একটা জমি যেমন সরাসরি ব্যক্তির মালিকানায় থাকে, তেমনি সেটা গোত্রের সামষ্টিক ভৌগোলিক সীমার ভেতর থাকার কারণে পরোক্ষভাবে গোত্রের সম্পত্তিও। কাজেই গোত্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে জমির মালিকানাতে গোত্রভুক্ত মানুষদের আধিপত্য থাকবে। এটা গোত্রবাদী সামাজিক সংহতির জন্য জরুরি ছিল। যেহেতু ছেলেরা গোত্রের ভেতরকার সদস্য আর মেয়েরা বিয়ের পর ভিন্ন গোত্রের সদস্য হয়ে যায়, সেহেতু মেয়েরা জমির অংশীদার হবে না। এটাই স্বাভাবিক ছিল তখনকার পিতৃতান্ত্রিক সমাজে। সে কারণেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছাড়া দুনিয়া জুড়ে মেয়েদের পৈতৃক সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার ঘটনা সাম্প্রতিক। গত শ'খানেক বছরের ঘটনা। চৌদ্দশত বছর আগে ইসলাম বরং গোত্রবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে কম পাত্তা দিয়ে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার দিয়েছে। যতটুকু দিয়েছে সেটা সেই কালের বাস্তবতায় বৈপ্লবিক ঘটনা ছিল। একটা বিষয় খেয়াল করবেন মেয়েরা গোত্রের ভৌগোলিক সীমার ভেতরকার জমি সাধারণত পায় না। হয় সেটা অর্থমূল্যে পরিশোধ করা হয় অথবা গোত্রীয় সীমার বাইরের জমি দেওয়া হয়। আরেকটা বিষয়, মায়ের সম্পত্তি বণ্টনে ছেলেমেয়ে সমান পায়। কারণ মায়ের সম্পত্তি বণ্টনে গোত্রের সীমা তেমন সমস্যায়িত হয় না। মায়েদের একদিকে যেমন জমি তেমন থাকে না, অন্যদিকে জমি থাকলেও গোত্রীয় সীমার ভেতর হয় না সাধারণত।

“

মানুষ দাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছে। কারণ মানবজাতির সামগ্রিক বোঝাপড়া (কালেক্টিভ কনসাসনেস) দাস ব্যবস্থার বিপক্ষে। একইভাবে দাসীদের সাথে যৌনতা অনুমোদনের বিপক্ষে। হাটে-বাজারে মানুষ কেনা-বেচার বিপক্ষে। শাস্তি হিসাবে শরীরী অঙ্গচ্ছেদের বিপক্ষে। মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে সভ্যতার বোঝাপড়া এগিয়ে চলেছে। এসব কিছু ধর্মের প্রতিপক্ষ না। বরং ধর্মের বৃহত্তর উদ্দেশ্যকেই এগিয়ে নেওয়া।

ইসলামে শরীয়ার উসুল, মাকাসিদ ইত্যাদি বিবেচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল উরফ। স্থান-কালের বিবেচনা। আমাদের যে বঙ্গীয় ভূমি এখানে গোত্রবাদের অস্তিত্ব কখনোই ছিলো না। বংশনির্ভর গ্রামীণ সমাজে কিছুটা গোত্রবাদের গন্ধ থাকলেও সেসব অতীত প্রায়। তাছাড়া আরবের গোত্রবাদের মতো সংহত ব্যবস্থা এখানে কখনোই ছিল না। স্থানীয়রা কিছু ঝামেলা করলেও ভিন্ন জায়গার মানুষ যেকোন জনপদে জমি কিনে বাড়ি বানিয়ে ধীরে ধীরে স্থানীয়দের সাথে মিশে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। আজকে পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টনে গোত্রের সামষ্টিক সম্পদের মতো করে গোত্রের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জরুরত নেই। যেহেতু আমাদের গোত্রবাদী সমাজ ব্যবস্থাই নেই। কিন্তু সম্পত্তি বণ্টনের প্রচলিত আইনে কেবল পুরুষরাই বেশি সুবিধা পায়। কাজেই ইসলামের নামে প্রচলিত বণ্টন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে পুরুষ ইসলামবাদীরা যতটা মরিয়া, নারীরা ঠিক ততটা নীরব।

এখানে শরীয়া বা আইন বিষয়ে একটা নোকতা দেওয়া জরুরি। আইনের লক্ষ্য থাকে একটা বিদ্যমান ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম কতটুকু প্রদান করলে ন্যায্য হতে পারে তা নির্ধারণ করে দেওয়া। এটা আইনের মৌলিক নীতি। কিন্তু আপনি যদি অতিরিক্ত প্রদান করেন তাহলে কোনভাবেই নিষিদ্ধ নয় বরং উৎসাহিত করা হয়। যেমনটি আমরা শ্রম আইনের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। শ্রম আইনের নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধা কমানো যায় না। কিন্তু বেশি দেওয়া যায়। এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর দাবিও করা যায়। এখন বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাগুলোও প্রদান করছে না, যেভাবে আমাদের দেশে মেয়েরা প্রচলিত আইনে যতটুকু পাওয়ার কথা সেটাই প্রায় মেয়েরা পায় না। এমন অবস্থায় সম্পত্তি বণ্টনে সমানাধিকার দাবি অবাস্তব মনে হতে পারে। এমনিতেই আমাদের বাঙালি মুসলমানদের ইসলাম বুঝ-ব্যবস্থা আধ্যাত্ম চর্চার চেয়ে অনেক বেশি রিচ্যুয়াল নির্ভর। ইসলামের মর্ম উপলব্ধির কোশেশ এখানে তেমন নেই। সমাজের ৯০ ভাগ মানুষের জীবনে ইসলামের জীবনবাদী প্রভাব নেই। সম্পত্তি বণ্টনের সময় এলে কথিত প্র্যাক্টিসিং মুসলমানদের বেশিরভাগ কেমন যেন উদাসী হয়ে যান। যেন বোনদের সম্পত্তি দেওয়াটা ঐচ্ছিক বিষয়। না দিলেও চলে।

রাষ্ট্রের কাছে এই মুহূর্তে প্রথম দাবি হবে পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টনে মেয়েদের না-দাবি তুলে দেওয়া। আইন অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন হতেই হবে। যার যার জমি দলিলসহ বুঝে নিতে হবে এবং বুঝিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় দাবি হবে প্রচলিত ধর্মীয় আইনের পাশাপাশি সমানাধিকারভিত্তিক একটা আইন তৈরি করা। সম্পত্তি বণ্টনে কোন আইন নারী কীভাবে বেছে নিবে, তার একটা যৌক্তিক দিক-নির্দেশনা থাকবে। যেহেতু সম্পত্তি বণ্টনের আইন ইসলামের বিধান অনুযায়ী করা হয়েছিল, এই আইনের যেকোন পরিবর্তনে ইসলামবাদীরা একটা পক্ষ। তাই পরিবর্তনটা কীভাবে ইসলামের ভেতর থেকেই করা যায়, সেই দিকে যত্নশীল হতে হবে তাদের।

লেখক: শিক্ষক ও চিন্তক

বৈষম্য দূর করতে উত্তরাধিকারে নারীর সমান অধিকার চাই

শাহনাজ সুমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ২৮ (১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র সকল শ্রেণির নাগরিকদের জন্য সমান অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করে বলেছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।" এর অর্থ হলো, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য রাষ্ট্র ও আইন দ্বারা বেআইনি। কিন্তু এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ও দুঃখজনক যে স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও উত্তরাধিকারে নারীদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়নি।

বাংলাদেশে উত্তরাধিকার আইন ও সম্পত্তির অধিকার ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও রাষ্ট্রীয় আইনসহ অনেক বিষয়ের মাধ্যমে প্রভাবিত একটি জটিল আইনী কাঠামোর দ্বারা পরিচালিত হয়। উত্তরাধিকার আইনের প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় আইন। যথাঃ মুসলিম আইন, হিন্দু আইন ও খ্রিস্টানদের জন্য বিভিন্ন বিধিবদ্ধ আইন। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের দ্বারা প্রণীত বৈষম্যমূলক ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইনের কারণে বাংলাদেশি নারীরা উত্তরাধিকারসহ সম্পত্তির সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে যা স্পষ্টভাবে দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ নারীর মানবাধিকার ও তাদের সমান অধিকারকে লঙ্ঘন করে। নাগরিক বৈষম্যমূলক আইনগুলো এখনও বিরাজ করছে যা সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদের প্রতিশ্রুতির স্পষ্ট লঙ্ঘন, যেখানে বলা হয়েছে মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বাতিল করা হবে।

দেশের সকল নাগরিকের অধিকার রক্ষা এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাংলাদেশের সকল আইন সংবিধানের আলোকে ইউরোপীয় নাগরিক আইনের আদলে প্রণীত হয়েছে। একমাত্র ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আইন যা নারীর অধিকার খর্ব করে তা ধর্মীয় নীতির উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। স্বাধীন দেশে এ ধরনের দ্বৈত ব্যবস্থা স্পষ্টতই অসাংবিধানিক। অধিকন্তু এটি 'জনগণের ইচ্ছার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হিসাবে' 'প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন' [৭ (২)] হিসাবে সংবিধানের প্রাধান্যকে ক্ষুণ্ন

করে। তাই এই আইন অসাংবিধানিক। এই অসাংবিধানিক বৈষম্যমূলক আইন নারীদের জীবন তথা সমগ্র সমাজে বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলছে।

বর্তমানে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে আমরা সবচেয়ে বড় যে সংকটের সম্মুখীন হচ্ছি তা হল বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা। পরিবার, অফিস-আদালত, যানবাহন, রাস্তাঘাট, কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্থানে নারী ও মেয়েশিশুরা যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়। এ সংকট নিরসনে সরকারের পাশাপাশি নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও উদ্যোগ নিচ্ছে। কিন্তু এসব উদ্যোগের মাধ্যমে এটি নির্মূল করা যাবে না, যদি না আমরা মূল কারণটার সমাধান করতে পারি।

> **উত্তরাধিকারে সমান অধিকারের অভাবে মেয়েশিশুকে ছোটবেলা থেকেই পরিবারে বড় করা হয় মূলত উপযুক্ত স্বামী খুঁজে অন্য বাড়িতে পাঠানোর জন্য। পরিবারের এই মানসিকতা বাল্যবিবাহ বাড়ায় এবং এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে নারীরা সারা জীবন পরজীবী হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়া পরিবারের দ্বিতীয় শ্রেণির সদস্য হিসাবে বিবেচিত নারীদের প্রতি নানা ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতন দেখে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও পুরুষতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক মানসিকতার চর্চা ও আচরণ গড়ে ওঠে। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে উত্তরাধিকারে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।**

বাল্যবিবাহ, নারীর প্রতি সহিংসতা, গার্হস্থ্য সহিংসতা, মাতৃমৃত্যু ইত্যাদির মূল কারণ পিতৃতন্ত্র। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই। যেখানে সকল ক্ষমতার মূল উৎস হল অর্থনৈতিক শক্তি, সেখানে নারীর সম্পত্তির মালিকানা খুবই সীমিত যা পরিবার থেকে শুরু হয়। এই সংকট মোকাবেলায় সবচেয়ে কার্যকরী ও মূল পদক্ষেপ হবে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে শক্তিশালী করা। অর্থাৎ উত্তরাধিকারসহ সকল সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যা পরিবার, সমাজ ও রাজনীতিতে নারীর অবস্থানকে শক্তিশালী করবে।

উত্তরাধিকারে সমান অধিকার না থাকা নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা দেখেছি যে কিছু দিন আগে দুইজন নারী সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও পুলিশে নিয়োগ পাচ্ছেন না তাদের নিজস্ব ঠিকানা না থাকার কারণে। শেষ পর্যন্ত এর জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের দেশের নারীরা সব ধরনের কৃষিকাজ করলেও জমি না থাকায় সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনকি ভূমিহীন নারীরাও খাসজমির মালিক হোন না যদি না তাদের স্বামী বা সক্ষম ছেলে থাকে।

উত্তরাধিকারে সমান অধিকারের অভাবে মেয়েশিশুকে ছোটবেলা থেকেই পরিবারে বড় করা হয় মূলত উপযুক্ত স্বামী খুঁজে অন্য বাড়িতে পাঠানোর জন্য। পরিবারের এই মানসিকতা বাল্যবিবাহ বাড়ায় এবং এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে নারীরা সারা জীবন পরজীবী হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়া পরিবারের দ্বিতীয় শ্রেণির সদস্য হিসাবে বিবেচিত নারীদের প্রতি নানা ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতন দেখে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও পুরুষতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক মানসিকতার চর্চা ও আচরণ গড়ে ওঠে। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে উত্তরাধিকারে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।

নারী সংগঠনগুলো যখনই সমান উত্তরাধিকার আইনের জন্য আওয়াজ তুলেছে তখনই রাষ্ট্র একটি খোঁড়া অজুহাত নিয়ে এসেছে যে, সমাজ তার জন্য প্রস্তুত নয়। রাষ্ট্র এখনও নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার জন্য জাতিসংঘের কনভেনশনের (সিডও সনদ) অনুচ্ছেদ ২ ও অনুচ্ছেদ ১৬.১ (গ)-এর উপর সংরক্ষণ আরোপ করে রেখেছে। এই সংরক্ষণ সংবিধানের ১০, ১৯, ২৬, ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদের মূল নির্যাসগুলির সাথে সাংঘর্ষিক এবং যা স্বাধীন-সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে উচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা ৫ সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। যেখানে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তিনটি উপায় 'অর্থনৈতিক সম্পদ, সম্পত্তির মালিকানা এবং মহিলাদের জন্য আর্থিক পরিষেবাগুলির সমান অধিকার বৃদ্ধি করা; প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের প্রচার; এবং লিঙ্গ সমতার জন্য নীতি গ্রহণ, শক্তিশালীকরণ এবং আইন প্রয়োগ করা' নিয়ে কোন আলাপ ও কার্যক্রম নেই।

আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় পৌঁছেছে। এই অবস্থানকে শক্তিশালী করতে এবং অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদের সবাইকে অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করতে হবে। নারীদের শুধু সরকারি-বেসরকারি চাকরি বা গার্মেন্টসে সস্তা শ্রমিক হিসাবে রেখে দিলে অর্থনীতির পরবর্তী ধাপে যাওয়া সম্ভব হবে না। এজন্য দরকার দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং শিক্ষা, দক্ষতা ও পুঁজি সমাজের সকল শ্রেণির কাছে পৌঁছে দেওয়া। একই সাথে উত্তরাধিকার ও পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি তৈরি করতে হবে।

তাই সাম্য-মানবিক মর্যাদা-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে, রাষ্ট্রকে সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অঙ্গীকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখতে এবং জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন করে সমস্ত ধর্ম ও লিঙ্গের নাগরিকদের জন্য সমান উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা এবং একটি সমতাপূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

লেখক: নারী ও মানবাধিকার কর্মী

সম্পত্তি সম-বণ্টনে ধর্মের অজুহাত এবং প্রকৃত বাস্তবতা

মীর হুযাইফা আল মামদূহ

"নারী-পুরুষের সম্পত্তির সমান বণ্টনের আলাপ আসলেই বেশ কয়েকটা কথা ওঠে...

১. ইসলাম নারীকে অনেক বেশি অধিকার দিয়েছে। ফলে বাবার সম্পত্তির সমান বণ্টনের আলাপ ফাও। এটা ইসলাম ও কোরান বিরোধী।

২. ইসলাম অনুযায়ী নারী নানান পুরুষ (বাবা, ভাই, স্বামী) থেকে সম্পত্তি পায়। ফলে নারীর অংশ কম থাকে না।

কিন্তু এতসব আলাপের মধ্যেই যেই কথাটা একদমই উঠে না তা হচ্ছে, নারী এই সম্পত্তি পায় কি না। ভাইয়েরা কি বোনের সম্পত্তি বুঝিয়ে দেয়, নাকি সেটা লামে-ছামে একটা বুঝ দিয়ে, কখনও অল্প টাকা দিয়ে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। এই দেশের বেশিরভাগ মুসলমান নারীই তার প্রাপ্য সম্পত্তি পান না। ভাইয়েরা ভাবেন, বোনকে ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিলেই সম্পত্তির দাবি ছেড়ে দিবে। বোনরাও সেটাই ভাবেন। তাছাড়া অনেকে তো ভাবেন বোনেরা সম্পত্তি চাইবে কীভাবে, শরম থাকলে তো চাইবে না। এত কিছু করছে তাদের জন্য ভাই, বাপ!

আমার নানু বাবার সম্পত্তির ঠিকঠাক ভাগ পেলে প্রায় লাখ পঞ্চাশেক টাকার সম্পত্তি পেতেন। সেখানে এক লক্ষ টাকা দিয়ে ভাইয়েরা তাদের থামিয়ে দিয়েছে। জীবদ্দশায় তাকে এই বিষয়ে কথাই শোনানো যেত না, শরম বলে। অথচ তার ভাইয়েরা প্রায় সবাই বিশাল ধর্ম মানা লোক বলেই নিজেদের দাবি করেন, প্রদর্শন করেন।

এত এত বছর গেল, আপনারা বোনদের প্রাপ্য সম্পত্তি তাদের কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেওয়ার সংস্কৃতিটাই চালু করতে পারলেন না! বরং বোনদের সম্পত্তি নেওয়াটাকে নেতিবাচক করে রাখলেন। এবার যখন নারী সম্পত্তি সমান করে পাইতে চাইলো,

আপনারা কোরানের দোহাই দিচ্ছেন। যেন-বা কোরানের বাকিসব নির্দেশনা আপনারা সঠিক মানছেন, ব্যস, কেবল এখানে এসেই বাধা পড়ল!

অথচ কোরানের এই আইন এমন না যে, বিপরীত করলে কোরানের বিরোধিতা করা হবে। আপনি যদি আপনার বোনকে সমান ভাগও দেন, তাতে কোরান বিরোধিতার গুনাহ হবে না। বরং সওয়াব হওয়ার সম্ভবনাই বেশি। তাছাড়া কোরানের এই ভাগ কেবলই পরিত্যক্ত সম্পদের বন্টনের বেলায়। যদি বাবা মারা যাওয়ার আগে সম্পত্তি সমহারে বন্টন করে দিয়ে যান, সেটা বাবা করতেই পারবেন। এই ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞাই নেই।"

আমি এই লেখাটা ফেসবুকের জন্য লিখেছিলাম গত এপ্রিলে। দুশোর মতো শেয়ার হয়েছিল। আমার লিস্টের ম্যালা মানুষ কমেন্টও করেছিলেন সেখানে। সেই কমেন্টগুলো থেকে একটা-দুটো একটু দেখা যেতে পারে। আমাকে ইনবক্সে একজন লিখেছিলেন–

আমার আম্মা প্রায় ৫০/৬০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি পাবে ভাইদের কাছে। উনারা বিশ্বাসই করতে রাজি না সম্পত্তি আমরা পাবো! পরে আমি আম্মারে নিয়ে বন্টন অনুসারে পরিবারের সবার সম্মতিক্রমে আমার নামে জমিগুলো আম্মার থেকে হেবা কওলা করি। জমি কওলার কারণে বড় বড় আলেমদের কাছে আমি অভিশপ্ত!

আমারে হুমকি দেয় বাহিরে বিক্রি করলে খবর আছে। ওরা এখন পর্যন্ত ১০ লাখের মতো দিবে বলতেছে! আমি যদি বাহিরে বিক্রি করি পাচ্ছি ৫০/৬০ লাখ! আমার চক্ষুলজ্জার কারণে জমিগুলো বিক্রি করি না। তারা যদি তিনভাগের দুইভাগ টাকাও দিত, আমি তাদের দিতাম। কিন্তু তারা ১০ লাখের বেশি দিবে না!

আমার নানারা কিন্তু জেনারেল পরিবার না। সবাই মুহাদ্দিস, প্রভাষক, প্রিন্সিপাল! ১০০-তে ১০০ আলেম ফ্যামিলি যেটা আরকি। চক্ষুলজ্জায় বাহিরে শেয়ার করি না।

আহমেদ ইসহাক নামে একজন লিখেছিলেন–

আমার নানার ২ ছেলে। একজন মুফতি, একজন নামকরা একটা মাদ্রাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও জনপ্রিয় বক্তা। পর্যাপ্ত আর্থিক সচ্ছলতা থাকার পরও তারা নানার প্রায় সব জমি ছলে-বলে-কৌশলে বিক্রি করে নিজেদের পকেটে ঢুকিয়েছে, নিজেদের নামে অন্যত্র জমি কিনেছে, অবশিষ্ট জমি বন্ধক রেখে দিয়েছে মানুষের কাছে। বোনদের হকের কথা বলায় সর্বোচ্চ আক্রোশের শিকার আমাকে হতে হয়েছে। দুই মুফতি মুহাদ্দিসের পিতা আমার নানাও কোনভাবে রাজি না মেয়েদের হক দিতে।

নানির কোন ভাই না থাকায় পৈতৃক জমি বিক্রি থেকে মোটামুটি বড় অংকের টাকা পেয়েছেন, সব ছেলেদের পকেটে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আমার বাবা তাদের থেকে জমি কিনেছিলেন ৩৫ শতাংশের মতো। টাকা সাথে সাথে পরিশোধ করলেও দলিল রেজিস্ট্রেশন করে নিতে নানারকম সালিশ, দেন-দরবার করে কয়েক বছর সময় লেগেছে।

সাজ্জাদ হোসাইন লিখেছেন–

আমার আম্মু পেত ৮০-৯০ লক্ষ টাকার মতো সম্পত্তি। ৯ লাখ টাকা দিয়ে লাম-ছাম দিয়ে দিছে।

নাবিউল হাসান নামে একজন লেখাটি শেয়ার দিয়েছিলেন, সেখানে একজন কমেন্ট করেছেন। (যেহেতু তিনি ফ্রেন্ড প্রাইভেসি দিয়ে লেখাটি শেয়ার করেছেন, তাই কমেন্টদাতার নাম বলছি না।)

এই ব্যপারটা নিয়ে কখনও ভাবার প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু একটা ঘটনার সম্মুখীন হবার পর মনে হল আসলেই এটি নিয়ে ভাবা উচিত।

আমার এক কাজিনের ক্যান্সার ধরা পড়ে ২০২০-এর দিকে। চিকিৎসার জন্য ভরসা সরকারি হাসপাতাল ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট। এখানে কী পরিমাণ হয়রানি হতে হয় যারা না গেছেন বুঝবেন না। সরকারি সেবা পাওয়া কতটা দুঃসাধ্য ব্যাপার এটি বাংলাদেশে সবাই কম-বেশি জানে। একদিনের কাজ এক সপ্তাহ ঘুরে করতে হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই ঢাকায় থাকা লাগে। চিকিৎসার সাথে ঢাকায় থাকা-খাওয়ার খরচ করতে অনেক টাকার প্রয়োজন। আসল কথায় আসি। ছোটবেলায় তাদের বাবা মারা যান। রেখে যান দুটো মেয়ে। জমি যা ছিল চাষ করে মা-সহ তাদের তিনজনের দিন চলে যেত। কিন্তু হঠাৎ ক্যান্সার ধরা পড়ায় অনেক টাকার প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রথমে জমি বিক্রি করে বেশ কিছুদিন চিকিৎসা চালিয়েছে, কিন্তু তা পর্যাপ্ত ছিল না। পরেরবার যখন জমি বিক্রি করতে চায় তখন তার চাচাতো ভাইয়েরা বাধা দেয়। কারণ আইন অনুযায়ী বাবার সম্পত্তির কেবল কিছু মেয়েরা পাবে। এ নিয়ে দেন-দরবার করে সম্পত্তি ভাগাভাগি করা হয়। পরবর্তীতে তাদের ভাগেরটা বিক্রি করে চিকিৎসা চালিয়ে যায়। ক্যামো প্রায় সবগুলো দেওয়া হয়েছে, কয়েকটা মনে হয় বাকি ছিল। মেয়েটার মনের অবস্থা এরকম হয়েছিল, সে আর চিকিৎসা করাতে চায় না। তার বক্তব্য "আমি এমনিতেও মারা যাব, আমার পিছনে সব খরচ করে ফেললে তোমরা খাবে কী? আমার ছোটবোন আছে। আমার পিছনে আর টাকা খরচ করার দরকার নাই।"

এ বছরের শুরুতে মেয়েটা মারা গেছে।
এ ব্যপারগুলো আসলে ভাবায়। আপনি তার গোষ্ঠী হিসাবে সম্পত্তি পাবেন ঠিক আছে। তবে আপনার তো কিছু দায়িত্ব-কর্তব্যও আছে। আপনারা কেবল তার বাবার সম্পত্তি দেখলেন, মেয়েটাকে দেখলেন না। তার বাবার সম্পত্তিতে আপনাদের ভাগ আছে বুঝলাম, কিন্তু যে মেয়েদের তিনি রেখে গেছেন তাদের প্রতি কি কোন দায়িত্ব-কর্তব্যের আইন নাই?

একটু ঘেঁটে দেখলে দেখা যাবে, নারীদের ক্ষেত্রে সম্পত্তি না দিয়ে থাকার হার অনেক বেশি আমাদের সমাজে। ইসলাম নারীকে যে পরিমাণ সম্পত্তির মালিক করে দিয়েছে নানা দিক থেকে, সেইটুকু সম্পত্তি পুরুষরা নারীকে দিতে চাইছে না। চায় না। সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই বিভাজন দূর করবার দায়টা নেবে কে? সরকার? নেবে কি? যদি নেয়, সেক্ষেত্রে এই জায়গাটাতে খুবই শক্তভাবে কাজ করা উচিত।

তাছাড়া আমাদের দেশীয় আইনের ঠিক কী কী আছে শরীয়া মাফিক, যা মানা হয়? চুরির বিধান কিংবা অন্য অনেক ক্ষেত্রে কোরানের সরাসরি নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সেখানে মানা হচ্ছে ব্রিটিশ আইন। সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীকে সমান অংশ দেবার ব্যাপারেও হয়ত একইভাবে কোন আইন করা যেতে হতে পারে।

আলেম-উলামা ও দেশের আইনজ্ঞরা বসে ভাবতে পারেন।

লেখক: মীর হুযাইফা আল মামদূহ'র পড়াশোনা হিফজুল কোরআন, দাওরায়ে হাদীস। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি এই অঞ্চলের ইসলাম চিন্তার বৈচিত্র্য এবং সেসবের সামাজিক ও রাজনৈতিক বোঝাপড়া নিয়ে গবেষণা করছেন।

হিন্দু নারীর আলোর পথ: পরিবর্তন ও মুক্তির যাত্রা

ঝুমুর বিশ্বাস

কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। বড় চাঁদের আলোয় চারপাশ ভরে ওঠেছে জাদুকরী দীপ্তিতে। লক্ষ্মীপূজার সে রাতে সবাই দেবী লক্ষ্মীর কাছে ধন-সম্পদ কামনা করছেন। একদিকে হয়তো কোন মহামানব ধন-দৌলতের আশায় লক্ষ্মী দেবীর কৃপা প্রার্থনা করে দেবীর পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করছেন তার মা-বোনদের বঞ্চিত করার জন্য। এ এমন এক অসঙ্গতি যেখানে প্রত্যাশার মূলে রয়েছে স্বার্থপরতা। দেবীর আশীর্বাদ প্রত্যাশায় চাঁদের আলোয় দীপ্তিময় এই রাত যেন আমাদের মানবিক মূল্যবোধের পরীক্ষাও নিচ্ছে। মাতৃত্বের অসীম শক্তি অথচ মা'কে সম্পত্তি দেওয়ার প্রশ্নে কত শত দ্বিধা-বিভক্তি, কুযুক্তি। বাংলাদেশের প্রচলিত হিন্দু আইনে উত্তরাধিকার সূত্রে নারীদের পিতার সম্পত্তিতে যেমন কোন অধিকার নেই, তেমনি স্বামীর সম্পত্তিতেও তাদের কোন অধিকার নেই। মোটকথা হল বাংলাদেশের হিন্দু নারীরা জন্ম থেকেই নিঃস্ব।

হিন্দু আইনে সাধারণত নারীরা দুইভাবে সম্পত্তির অধিকারী হোন–
১. নারীর সম্পত্তি এবং
২. স্ত্রীধন

নারীর সম্পত্তি

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর (বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতার মাতা এবং পিতার পিতার মাতা) যে সম্পত্তি লাভ করে তা হল নারীর সম্পত্তি। এক্ষেত্রে নারীরা নারীর সম্পত্তিতে শর্তসাপেক্ষে সীমিত স্বত্বে অধিকারী হোন। অর্থাৎ দান, বিক্রয় করতে পারেন না যৌক্তিক কারণ ব্যতিত।

স্ত্রীধন

কোন নারী কুমারী, বিবাহিতা, বিধবা অবস্থায় উত্তরাধিকার ব্যতিত কোন সম্পত্তি অর্জন করলে অথবা নিজের উপার্জন দ্বারা কোন সম্পত্তি অর্জন করলে তা স্ত্রীধন নামে পরিচিত।

সম্পত্তিতে হিন্দু মহিলার অধিকার আইন-১৯৩৭ অনুযায়ী হিন্দু বিধবা পুত্রের সমান অংশ পাবেন এবং উক্ত সম্পত্তিতে জীবনস্বত্বে অধিকারী হবেন। হিন্দু কন্যা ভাইয়ের উপস্থিতিতে সম্পত্তির কোন অংশ পান না। ভাই না থাকলে জীবনস্বত্বে সম্পত্তি লাভ করেন। জীবনস্বত্বে সম্পত্তি থাকা আর না থাকায় কোন পার্থক্য নেই। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি নারী ইচ্ছে অনুযায়ী ভোগ-দখল করতে পারেন না।

নারীদের সম্পত্তির অধিকার সীমাবদ্ধ থাকার ফলে তারা আর্থিকভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এই কারণে বেশিরভাগ নারী জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। উত্তরাধিকারহীনতার ফলে তাদের জীবন চলে যায় অদৃশ্য আগাছার মতো। সবচেয়ে কষ্টকর ও অমানবিক জীবন কাটান স্বামী নির্যাতিতা ও বিধবা নারীরা। সন্তান লালন-পালন তো দূরের কথা, মাথা গোঁজার জন্য সঠিক আশ্রয়েরও তারা অধিকারী হোন না। জীবনটা কাটে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশির দ্বারে দ্বারে ঘুরে। আর কী-ইবা করার আছে। না আছে জমি কেনার সম্বল, না আছে ঘর তোলার সম্বল। লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ে তো আগেই যুদ্ধ করার শক্তি হারিয়েছে। শব্দ করে কথা না বলা, উচ্চস্বরে কথা না বলা, লম্বা করে ঘোমটা টেনে মাথা নিচু রাখার সংস্কৃতি তারা জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই ধারণ করে এসেছে। হিন্দু ধর্মে প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথা এবং বৈষম্যমূলক আইনগুলোই এর জন্য দায়ী। শুধু সম্পত্তির ক্ষেত্রে নয়– এই বৈষম্য বিদ্যমান বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব এবং নারীদের দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রেও। বহুকালের পুরুষ শাসিত সমাজে মহিলাদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ আজও অব্যাহত রয়েছে।

দেশের সর্বোচ্চ আইন বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমতা ও সমান সুযোগের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে (১৯, ২৭, ২৮, ২৯) নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য করা যাবে না এবং সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা হবে, এটা আমাদের আইনের মৌলিক ভিত্তি। কিন্তু বাস্তবতা হল আমাদের সমাজে পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা এবং পুরুষদের ব্যক্তিগত সুবিধার প্রতি অদৃশ্য এক শ্রদ্ধা এত গভীরে প্রোথিত যে সকল ন্যায়, সমতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রায়শই গৌণ হয়ে পড়ে।

এই বৈষম্য জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে। যখন সমাজে নারীদের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ না দেওয়া হয় তখন তাদের পূর্ণ সক্ষমতা বিকাশ পায় না, যা দেশের সার্বিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর। নারীরা যদি তাদের প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হোন, তাহলে দেশ তাদের পূর্ণ মানবসম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। এই বৈষম্যের ফলে শ্রমবাজার-শিক্ষা-রাজনীতি ও অন্যান্য খাতে নারীদের অংশগ্রহণ কমে যায়, যা সামগ্রিকভাবে জাতির উন্নয়নকে থামিয়ে দেয় বা মন্দায় ফেলতে পারে।

একজন নারী যদি তার নিজের পছন্দ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে না পারে, যদি সে তার মতামত বা যোগ্যতা প্রয়োগ করতে না পারে, তবে দেশ কখনোই সমৃদ্ধ ও উন্নত হতে পারবে না। সুতরাং নারী-পুরুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য এক অপরিহার্য শর্ত।

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে The Hindu Succession Act, 1956-র মাধ্যমে ভারতে পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার সমান অংশীদারত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে, সংশোধন করা হয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন। বিলোপ হয়েছে যুগ-যুগান্ত ধরে চলা প্রচলিত সকল বৈষম্যের। ভারতীয় আইন কুসংস্কারমুক্ত হয়ে নারীবান্ধব হয়েছে। আমরা চলছি শত বছরের ঘুণে ধরা জীর্ণ-শীর্ণ আইন দিয়ে, যা বর্তমান সময়ে পুরোপুরি অকার্যকর। এতে নারীর জীবন হয়েছে দুর্বিষহ। উত্তরাধিকারহীনতায় নারী কেমন জীবন পার করে তার জন্য কোন গভীর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নেই, শুধু প্রয়োজন নিজের বিবেকের যথাযথ প্রয়োগ। নারীদের সম্পত্তি না দেওয়ার ব্যাপারে বর্তমান সময়ে যেসব যুক্তি উপস্থাপিত হচ্ছে তা অত্যন্ত হাস্যকর। মূলত তারা তাদের বিনা কষ্টে অর্জিত সুবিধা কোনভাবেই হারাতে চায় না।

আইন ও সমাজে নারীর সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য কিছু সংস্কারের প্রয়োজন হতে পারে। যেমনঃ

প্রথা ও প্রচলিত আইনের সংস্কার

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীদের সম্পত্তির অধিকারকে আরও সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। নারীদের সম্পত্তির অংশ নিশ্চিত করতে প্রচলিত আইনকে সংশোধন করা প্রয়োজন। হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদেও যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের কথা বলা আছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ

নারীদের মধ্যে আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন, যাতে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানেন এবং প্রয়োজনে দাবি করতে পারেন। নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নারীর সম্পত্তি অর্জনে সহায়তা করবে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

নারীদের জন্য আর্থিক শিক্ষা ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করা, যাতে তারা নিজেদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হোন।

সামাজিক সংস্কারে পরিবার ও সমাজের সমর্থন

পুরুষদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা উচিত, যাতে তারা নারীদের সম্পত্তির অধিকারকে সমর্থন করেন এবং এ বিষয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক চাপ সৃষ্টি না করেন।

কমিশন বা ফোরাম গঠন

নারীদের অধিকার রক্ষার জন্য শক্তিশালী বিশেষ কমিশন গঠন করা প্রয়োজন, যা নারীদের উত্তরাধিকারহীনতার কারণে সৃষ্ট সামগ্রিক সমস্যা নিরূপণ করে সমাধানে কাজ করবে।

এসব সংস্কার কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে নারীদের সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত হতে পারে। নারীদের সম্পত্তি প্রদান করার কথা মাথায় আসলেই যাদের মাথায় বাজ পড়ে, তাদেরকে নিজেদের জন্ম নিয়ে ভাবতে অনুরোধ করি। আর স্বার্থান্ধ না হয়ে যৌক্তিক হওয়ার দাবি রাখি। আসুন আমরা শুধুই সম্পত্তি নয়, পরস্পরের সুখ-দুঃখেরও ভাগীদার হওয়ার এবং সুন্দর সহাবস্থানের জন্য কাজ করি। মানবিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে আমরা যদি সবাই একে অপরের পাশে দাঁড়াই, তবে সমাজে সত্যিকারের সমতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

লেখক: আইনজীবী

উত্তরাধিকার আইন:
নারীকে সেলফহীন করে রাখার সবচেয়ে কার্যকর পিতৃতান্ত্রিক হাতিয়ার

মুরাদ হাসান

বাংলাদেশে হিন্দু নারীদের পিতার সম্পত্তিতে পুরুষের সমান ভাগ চেয়ে আদালতে একটা রিট হয়েছিল সম্ভবত ২০২৩ সালের মে মাসে। হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা অংশ এই রিটের বিরোধিতা করেছে। বিরোধীদের দোহাই, 'ধর্মান্তর বাড়বে, বোনকে যে সম্পত্তি দিবে স্ত্রীও একই সম্পত্তি বাপের বাড়ি থেকে পাবে, তাই নারীর সম্পত্তির দরকার নাই'– এই রকম! এইখানে প্রথম যুক্তির ত্রুটি হল, মানুষের ধর্মান্তরিত হওয়ার স্বাভাবিক রাইটকে অস্বীকার করা হচ্ছে। পরের যুক্তিটাতে নারীর স্বতন্ত্র সত্তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। আমি বহুদিন ধরেই পিতৃতন্ত্রের আগ্রাসনে সৃষ্ট নারীর সংকটকে প্রধানত নারীর সেলফহীনতা ও অর্থহীনতার সংকট বলে, বলে আসছিলাম। এই রিটের প্রতিক্রিয়াগুলোতে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল।

পিতৃতন্ত্রের কাছে নারীর একক কোন সেলফ নেই। ধর্ম ও সংস্কৃতি ভেদে কোথাও এই সেলফ হয়ে ওঠেছে অর্ধ, আবার কোথাও একেবারেই শূন্য। নারীর এই অর্ধ-সেলফ বা সেলফহীনতার বাস্তবিক নজিরই সবচেয়ে বেশি মূর্ত হয়ে ওঠেছে উত্তরাধিকার আইনে। একজন পুরুষ বাপের সম্পত্তি পাচ্ছে, একজন নারী পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না? কারণ তো শুধু এটাই হতে পারে নারীর কোন সেলফ নেই। নারীর যা আছে, তা পুরুষেরই অন্তর্ভুক্ত! নইলে 'বোনকে যে সম্পত্তি দিবে স্ত্রীও একই সম্পত্তি পাবে'– এই ধরনের লজিক সামনে আসত না। এই লজিককে উল্টিয়েও আলাপ পারা যায়। বোনকে যে সম্পত্তি দিবে, স্ত্রী তো সে সম্পত্তি আনবেই। তাহলে বোনকে দিতে আপত্তি কীসের? হা হা! এখানেও আপত্তি আসবে! আপত্তির মূল কারণ হল, নারীকে অর্থহীন করে রাখার আকাঙ্ক্ষা। অর্থহীন নারীকে অনুগত ও বন্দী করে রাখা যায়। তখন জুলুম করলেও মেনে নেয়। কারণ ছেড়ে যাওয়ার পথ থাকে না। কিন্তু যে নারী স্বনির্ভর, নিজের খরচ নিজে চালাতে পারে, তাকে অনুগত দাস করে রাখা কঠিন। জুলুম করেও আটকে রাখা সম্ভব না। স্বনির্ভর নারী বন্দিত্ব ও জুলুম থেকে বেরিয়ে আসবেই।

সুতরাং উত্তরাধিকার আইনে নারীকে পুরুষের মতো সম্পত্তির ভাগ দিতে না চাওয়া শুধু সম্পত্তি দিতে না চাওয়া নয়। মূলত নারীকে স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বনির্ভর হতে দিতে না চাওয়া। বদলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে নারীকে অনুগত দাস করে রাখার রাষ্ট্র-সমাজে চলমান প্রাচীন সফল আইনটারই ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রচেষ্টা।

রিট বিরোধিতার পোস্টগুলোতে বাঙালি মুসলমানের বিশাল একটা অংশের হাস্যরস করতে দেখা গেছে। তারা যুক্তি দিয়েছেন ভারতেই তো হিন্দু নারী-পুরুষ সমান উত্তরাধিকার পায়। তাদের দাবিও বাঙালি হিন্দু নারীর অধিকারের পক্ষে। এই অবস্থান আমারও। আমার দর্শন বলে, শুধু মানুষ হওয়ার কারণেই প্রত্যেক সন্তান প্রত্যেক পিতা-মাতার সম্পত্তিতে সমান অধিকার ডিজার্ভ করে। ধর্ম যা-ই হোক! পিতা-মাতার কাছে সন্তানের হকও তো এটাই। পিতা-মাতা সব সন্তানকে সমানভাবে দেখবে।

> “
>
> **পিতৃতন্ত্রের কাছে নারীর একক কোন সেলফ নেই। ধর্ম ও সংস্কৃতি ভেদে কোথাও এই সেলফ হয়ে ওঠেছে অর্ধ, আবার কোথাও একেবারেই শূন্য। নারীর এই অর্ধ-সেলফ বা সেলফহীনতার বাস্তবিক নজিরই সবচেয়ে বেশি মূর্ত হয়ে ওঠেছে উত্তরাধিকার আইনে। একজন পুরুষ বাপের সম্পত্তি পাচ্ছে, একজন নারী পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না? কারণ তো শুধু এটাই হতে পারে নারীর কোন সেলফ নেই। নারীর যা আছে, তা পুরুষেরই অন্তর্ভুক্ত!**

দ্বিচারিতা হল যেই বাঙালি মুসলমান হিন্দু নারীর পিতার সম্পত্তিতে পুরুষের মতো সমান অধিকারের দাবিতে সমর্থন দিয়েছেন এবং হিন্দুদের মধ্যে বিরোধী পক্ষকে নিয়ে হাস্যরস করছেন, তাদের বিশাল একটা অংশ নিজের ধর্মের নারীদের পুরুষের মতো সমান সম্পত্তির অধিকার দিতে চায় না। এমনকি ধর্ম যতটুকু অধিকার দিয়েছে নারীকে, ততটুকু থেকেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঞ্চিত করে! মানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হিন্দু নারীদের ন্যায়োচিত এই দাবির প্রতি বাংলাদেশের মুসলমানের বিরাট এই অংশটার সমর্থন ন্যায়োচিত কারণে নয়। বরং ধর্মীয় বিভেদগত কারণে। এইটাও নোকতা দেওয়ার মতো!

আমরা বাংলাদেশের হিন্দু নারীর মতোই মুসলিম নারীরও পিতার সম্পত্তিতে সমান অধিকার চাই। চাই অন্যান্য ধর্মের অনুসারী নারীদের জন্যও। এই চাওয়া আমার ধর্মের কাছে নয়, রাষ্ট্রের কাছে। রাষ্ট্রে যেহেতু নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য অসাংবিধানিক, যেহেতু রাষ্ট্রে নাগরিক হিসাবেও নারী-পুরুষের পার্থক্য নেই– অন্তত আইনে-সংবিধানে হলেও নারী-পুরুষের অধিকার সমান।

তবে ধর্মকেও আমরা বিবেচনার বাইরে রেখে এগিয়ে যেতে চাই না। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের ধর্মীয় মর্যাদা সমুন্নত থাকবে, এইটাই কাম্য। এই কারণে আমরা উত্তরাধিকার আইনে

পিতা-মাতার সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের (ছেলে-মেয়ে) সমান ভাগের পাশাপাশি রাষ্ট্রে ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইনেরও সহাবস্থান চাই। নারী কোন আইনের উপর ভিত্তি করে সম্পত্তির অধিকার নিবে, এইটা ঠিক করবে একমাত্র নারী। ইচ্ছে হলে রাষ্ট্রের, ইচ্ছে হলে ধর্মের বিধান মেনে। এই ব্যাপারে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ যেন না করতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে! একটা সেক্যুলার রাষ্ট্রে এইটাই হবে কল্যাণকর। দুই পক্ষের পরস্পরের প্রতি উদারতাও দেখানো হবে!

যে নারীরা নারী-পুরুষের সমান উত্তরাধিকারের ন্যায়োচিত দাবি তুলেছেন তারা যেমন ইনসাফ পাবেন, তেমনি যেই নারীরা ধর্মীয় আইনকে প্রাধান্য দিয়ে সম্পত্তির হিস্যা নিতে চাইবেন তারাও ইনসাফ পাবেন।

> **আপত্তির মূল কারণ হল, নারীকে অর্থহীন করে রাখার আকাঙ্ক্ষা। অর্থহীন নারীকে অনুগত ও বন্দী করে রাখা যায়। তখন জুলুম করলেও মেনে নেয়। কারণ ছেড়ে যাওয়ার পথ থাকে না। কিন্তু যে নারী স্বনির্ভর, নিজের খরচ নিজে চালাতে পারে, তাকে অনুগত দাস করে রাখা কঠিন। জুলুম করেও আটকে রাখা সম্ভব না। স্বনির্ভর নারী বন্দিত্ব ও জুলুম থেকে বেরিয়ে আসবেই।**

এই চিন্তা ফেসবুকে প্রকাশ করার পর কেউ কেউ এ নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। উনারাও কিন্তু নারী-পুরুষের সমান উত্তরাধিকারের দাবিতে একমত। উনাদের আপত্তিটা ছিল, এক দেশে দুই আইন। এইটা নাকি বেখাপ্পা লাগে। উনাদের অবগতির জন্য বলছি, বাংলাদেশে বর্তমানেও একাধিক উত্তরাধিকার আইন বিদ্যমান। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি।

মূলত উনাদের আপত্তিটা ছিল ভিন্ন জায়গায়। রাষ্ট্রে নারী-পুরুষের সমান উত্তরাধিকার আইন কায়েম হওয়ার পরও নারীদের একটা অংশ ধর্মীয় বিধি মোতাবেক সম্পত্তির ভাগ নিবে, এইটা মানতে না পারা। এইটা সামাজিক অসহনশীলতাও যা বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় করছে। তারা সমান অংশীদারত্বে বিশ্বাসী এবং দাবিদারদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করছে। যেকোন ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সহনশীলতা এবং উদার হইতে পারার দরকার আছে, বিপরীত আইডিওলজির প্রতিও। এগুলোই মূলত আন্দোলন সফল করে। সমাজে সহনশীল সহাবস্থানও নিশ্চিত করে।

লেখক: কবি ও এক্টিভিস্ট

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ 'নারী অঙ্গন' পোর্টালে প্রকাশিত

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এবং একটি পর্যালোচনা

আজহারুল হক লিংকন

নারী-পুরুষের সম্পত্তি ভাগের বিষয়ে সমান অধিকারের প্রসঙ্গে একটা কথা উঠেছে। অনেকেই দেখছি এর প্রাসঙ্গিক দার্শনিক দিকটিকে উপেক্ষা করে নির্ভেজাল কুতর্কে লিপ্ত হচ্ছেন।

সম্পত্তির মালিকানার প্রশ্ন নানান দিক থেকে বিবেচিত হতে পরে। কিন্তু আপনি যখন ভাগাভাগির ব্যাপারে আলোচনা করবেন, তখন তার ন্যায্য হকের ভিত্তি নিয়ে আলাপ উঠাতে হবে।

শ্রম হচ্ছে মালিকানার প্রশ্নে প্রধান নির্ণায়ক। শ্রম যার মালিকানা তার। বাবার পরিশ্রম ছেলে বেশি পাবে, কিন্তু মেয়ে কম পাবে কেন? কম পাবে এই কারণে যে, মেয়েকে বাবার বাড়ি ছেড়ে স্বামীর বাড়িতে চলে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে বাবার সম্পত্তির সমান ভাগ মেয়ে পেলে জীবদ্দশায় নিজের অর্জিত সম্পদের একটা বড় অংশ অন্য আরেকটা পরিবার/ সমাজের কাছে চলে যাবে। এইটা হচ্ছে পরিবার-কেন্দ্রিক দিক থেকে যদি চিন্তা করি।

আবার সামাজিক দিক থেকে ভাবলে একটা কৃষিপ্রধান দেশের সম্পত্তির মালিক আর সম্পত্তির মালিকের অবস্থানের দূরত্ব যত বাড়বে, সেই জমি অনাবাদি থাকার সম্ভাবনা ততো বাড়বে এবং সামাজিক ও জাতীয় কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ততো কমবে। সুতরাং গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে নারী-পুরুষের সম্পত্তির ভাগের পরিমাণগত পার্থক্য আসলে ব্যক্তি বৈষম্য নয় বরং সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তির প্রাধান্যকে খর্ব করে সমাজকে কেন্দ্রে স্থাপন করা।

এখন যেখানে সমাজ ও পরিবার ভেঙে টিকে আছে শুধু রবিনসন ক্রুসোর মতো অসহায় আর নিঃসঙ্গ ব্যক্তিবর্গ, সেখানে কোন অফিসে একই পোস্টে সমান দায়িত্ব পালনে সক্ষম নারী-পুরুষের আলাদা বেতন কাঠামো হলে সেটা কি গ্রহণযোগ্য হবে? গ্রামীণ সমাজ ভেঙে গেছে বহু আগে। পরিবারগুলো পোলিও রোগীর পায়ের মতো শুকিয়ে উল্টো হয়ে ঝুলে আছে ঐতিহাসিক কঙ্কালের ছায়া হয়ে।

এই শহুরে সমাজে নারী-পুরুষের যে ভেদ, সমাজ ও পরিবারের প্রতি যে ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য, সেটাও পুঁজির দেয়ালের নিচে কবর হয়ে গেছে। শহুরে মানুষের কোন সমাজ নেই, পরিবার নেই। এইখানে একটাই পরিচয় এখন মানুষের। কর্ম। চাকরি। সরকারি, কর্পোরেট অথবা উদ্যোক্তা।

এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় পুরুষ আর নারী বলতে এতদিন যে ভিন্ন সামাজিক, পারিবারিক কর্ম-দায়িত্বের বৃত্তের মধ্যে আমরা নারী-পুরুষকে দেখে অভ্যস্ত সেটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অনেক শহুরে পরিবারেই লক্ষ্য করবেন, ছেলে বাবা-মায়ের দায়িত্ব নিচ্ছে না। কিন্তু মেয়ে নিচ্ছে বা নিতে হচ্ছে। দায়িত্ব নারী-পুরুষের স্থান পরিবর্তন করেছে। সেই পরিবর্তিত বাস্তবতায় আল্লার আইনের ভেতর কি পরিবর্তিত হওয়ার সুযোগ নেই?

আল্লাহ বলেছেন মেয়েকে ন্যূনতম ছেলের অর্ধেক সম্পত্তি প্রদান করতে। পরিবর্তিত বাস্তবতায় সমান দিতে নিষেধ বা নিরুৎসাহিত কি কোথাও করেছেন? কিংবা সমান দিলে কি গুনাহ বা আল্লাহর কোন আইনকে অমান্য করা হবে? ইসলাম একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক ধর্ম। পুরুষতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বার্থের কাজে লাগার জন্য আমার নবী সমস্ত জীবন সমতার জন্য সংগ্রাম করেন নাই।

ইসলামী আইন-কানুন সম্পর্কে যারা খোঁজ-খবর রাখেন তারা ভালো করেই জানেন এই আইন কতটা ফ্লেক্সিবল এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগের সুযোগ রেখেছে। ইসলামী আইনের ভেতর চুরি করলে যেমন চোরের হাত কাটার বিধান রয়েছে, আবার অভাবের কারণে চুরি করলে ক্ষমার বিধানও রয়েছে। আবার শাসকের অদক্ষতায় সৃষ্ট অভাবের কারণে চুরি হলে শাসকের হাত কাটার বিধানও রয়েছে। সুতরাং ইসলামী আইনের দোহাই দিয়ে শহুরে পরিবর্তিত বাস্তবতায় সম্পত্তি ভাগের বেলায় কৃষিপ্রধান সমাজের সম্পত্তি ভাগের আইনকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির একমাত্র ও অপরিবর্তনীয় জ্ঞান করা, ইসলামী আইনের সময়ের সাথে যুগের চাহিদার সাথে পরিবর্তিত হওয়ার সামর্থ্যকে অস্বীকার করা। মনে রাখতে হবে ইসলাম নাজেল হয়েছে সমস্ত সময়ের জন্য। আর সমস্ত সময় টিকে থাকার জন্য নিজের ভেতর পরিবর্তনের সামর্থ্য আল্লাহ এখানে রেখে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেছেন মেয়েকে ন্যূনতম ছেলের অর্ধেক সম্পত্তি প্রদান করতে। পরিবর্তিত বাস্তবতায় সমান দিতে নিষেধ বা নিরুৎসাহিত কি কোথাও করেছেন? কিংবা সমান দিলে কি গুনাহ বা আল্লাহর কোন আইনকে অমান্য করা হবে? ইসলাম একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক ধর্ম। পুরুষতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বার্থের কাজে লাগার জন্য আমার নবী সমস্ত জীবন সমতার জন্য সংগ্রাম করেন নাই।

তাই ইসলামের স্বার্থেই সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকারের আইন প্রণয়ন করা এখন সময়ের দাবি। তবে যেসব নারী ধর্মীয় বিধি মতে সম্পত্তির ভাগ নিতে চান, তাদের জন্য সেই সুযোগটাও রাখা যেতে পারে।

লেখক: রাজনীতি বিশ্লেষক

পুরুষতান্ত্রিকতার ভিত্তি ও নারী

শান্তনু বোস

বাংলাদেশে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মূল নেত্রী নারী হওয়ার পরেও আমাদের দেশের নারীরা এখনও বিভিন্ন অধিকারগত জায়গা থেকে পিছিয়ে আছে, শিকার হচ্ছে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধার। এর কারণ একটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতর পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে, এমনকি সরকারেও নারী প্রতিনিধিত্ব থাকলেও পুরুষতান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা তারাও প্রভাবিত ও পরিচালিত হোন। ফলে নারী নেত্রী দ্বারা আমাদের দেশের সরকার পরিচালিত হলেও উক্ত নেত্রীগণ দিনশেষে পুরুষতন্ত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন।

'পুরুষতন্ত্র' শব্দটার সুলুক সন্ধান করা যাক। অনেকেই মনে করে পুরুষতন্ত্র মানে পুরুষ দ্বারা নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া জবরদস্তিমূলক সংস্কৃতি।

অথচ একজন নারীও পুরুষতান্ত্রিক হতে পারে।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় 'পুরুষতান্ত্রিকতা' হলো ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদ ব্যবস্থা ও তৎসম্পর্কিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভেতর গড়ে ওঠা আধিপত্যমূলক সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি দ্বারা নারীর পাশাপাশি খোদ পুরুষও আক্রান্ত।

ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের তাকাতে হবে এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' নামক চিরায়ত গ্রন্থে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ আবিষ্কার থেকে তিনি এখানে প্রমাণ করে দেখান যে, 'সমাজের গোড়ায় নারী ছিল পুরুষের ক্রীতদাসী'– একেবারেই ভুল ধারণা। অর্থাৎ ঐতিহাসিকভাবে নারী কখনোই পুরুষ দ্বারা শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত ছিল না।

এঙ্গেলস বিভিন্ন অঞ্চলের আদিম সাম্যবাদী সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং তাদের পরিবারের কাঠামোর ক্রমবিকাশের ইতিহাসমূহ তুলে ধরে দেখিয়েছিলেন সেখানে নারীদের স্বাধীনতা তো ছিলই বরং সমাজে তাদের সম্মানও যথেষ্ট ছিল। পরিবারগুলো

ছিল মাতৃতান্ত্রিক। সন্তানেরা মায়ের পরিচয়েই বড় হতো। ভিন্ন কোন গোত্র বা গোষ্ঠীর পুরুষের সাথে অন্য কোন গোত্রের নারীর বিবাহ হলে উক্ত নারীর সন্তানেরা মায়ের গোত্রেরই সম্পত্তির অংশীদার হতো। উল্লেখ্য, তৎকালে সম্পত্তির মালিকানা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারের ছিল না, ছিল মূলত সমগ্র গোত্রেরই। মূলত পরিবার ও সমাজে মাতৃপ্রাধান্যের এই ব্যাপারটিকে এঙ্গেলস বলেছিলেন মাদার রাইটস বা মাতৃ-অধিকার। এঙ্গেলসের মতে, যৌথ পরিবারগুলোর অধিকাংশ অথবা সমস্ত নারীই একটি মাত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকতো, আর পুরুষরা আসতো নানা গোষ্ঠী থেকে। এই হল নারীর প্রাধান্যের বাস্তব ভিত্তি।

এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা নিজ বংশে ধরে রাখার স্বার্থে সন্তানরা তখন পিতার পরিচয়ে পরিচিত হতে থাকল। এঙ্গেলসের মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবই মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ ঘটালো এবং এই ঘটনাকে এঙ্গেলস নারী জাতির বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয় বলে উল্লেখ করেছেন, যার ভার এখনও তাদের বহন করতে হচ্ছে।

কালক্রমে সভ্যতার বিকাশের ফলে উদ্বৃত্ত সম্পত্তির উদ্ভব হয় এবং সম্পত্তির উপর গোষ্ঠীর বদলে ব্যক্তি ও পরিবারের মালিকানা প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। পরিবারের কাঠামোরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ধন-দৌলত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিক দিয়ে নারীর চেয়ে পুরুষের মর্যাদা বাড়তে থাকে। অন্যদিকে পুরুষের এই মর্যাদা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে নিজের ছেলেমেয়েদের সুবিধার জন্য পুরোনো উত্তরাধিকার প্রথার উচ্ছেদ করার দিকে অবস্থা এগিয়ে যায়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মাতৃপ্রথা অনুসারে বংশ-পরিচয় নির্ধারণের নিয়ম ছিল, ততদিন পর্যন্ত উত্তরাধিকার প্রথা বদলানো সম্ভব ছিল না। তাই মাতৃ-অধিকার উচ্ছেদ করার দরকার হল এবং শেষ পর্যন্ত তা-ই হল। এভাবে সম্পত্তির উপর গোষ্ঠীগত মালিকানার বদলে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হল, যেখানে আবার আধিপত্যগত সুবিধা পেয়ে গেল পুরুষ।

এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা নিজ বংশে ধরে রাখার স্বার্থে সন্তানরা তখন পিতার পরিচয়ে পরিচিত হতে থাকল। এঙ্গেলসের মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবই মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ ঘটালো এবং এই ঘটনাকে এঙ্গেলস নারী জাতির বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয় বলে উল্লেখ করেছেন, যার ভার এখনও তাদের বহন করতে হচ্ছে।

ব্যক্তিগত মালিকানাই যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের পেছনে অন্যতম মূল কারণ, মার্কস ও এঙ্গেলসের এই ধারণার সত্যতা পাওয়া যায় আজকের বিভিন্ন মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী বা সমাজের সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থার দিকে তাকালে। ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে বড় মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীর নাম মিনাংকাবাউ (Minangkabau)। আগ্রহোদ্দীপক বিষয়, তারা ধর্মে মুসলমান এবং শরীয়া আইনের অনেক ব্যাপারই তারা মেনে চলে। কিন্তু তাদের সন্তানেরা মায়ের পরিচয়েই বড় হয়। ফলে সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকারও মায়ের থাকে।

❝

মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি সমাজেই একটা ভিত্তি কাঠামো থাকে, যার উপর নির্ভর করে উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে। যেমন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল একটা সমাজের ভিত্তি কাঠামো যার উপর নির্ভর করে সংস্কৃতি, প্রথা, আইনসহ বিভিন্ন উপরিকাঠামো গড়ে ওঠবে। একইভাবে ব্যক্তিমালিকানা নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরিকাঠামো হিসাবে গড়ে ওঠেছে পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি।

এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ মিনাংকাবাউ গোষ্ঠীতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাধান্য নেই। বরং সেখানকার সম্পত্তি গোষ্ঠী বা সামষ্টিক মালিকানার সম্পত্তি। তাদের প্রথা হল গোষ্ঠী মালিকানার সম্পত্তি কখনও গোষ্ঠীর বহির্ভূত কারও কাছে হস্তান্তর করা হবে না। ফলে উক্ত গোষ্ঠীর পুরুষ তো বটেই, বাইরের কোন গোত্র বা গোষ্ঠীর পুরুষদের সাথে মিনাংকাবাউ নারীদের বিবাহ হলেও মিনাংকাবাউ মায়ের সন্তানেরা শুধু মায়ের সম্পত্তির মালিকানাই পায়, পিতার সম্পত্তিতে সন্তানের কোন অধিকার থাকে না। পিতাও মায়ের গোষ্ঠী মানে মিনাংকাবাউ গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে মালিকানা পাবে না। উল্লেখ্য, ইসলামি শরীয়া উক্ত গোষ্ঠীতে প্রবেশের পর সম্পত্তির মালিকানা প্রথায় ছোট্ট পরিবর্তন এসেছে। তা হল পরিবারে কোন ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পত্তি থাকলে (যা পরিবারের কোন সদস্য নিজের অর্থে যোগাড় করেছে) তা ইসলামিক বিধান অনুযায়ী বণ্টিত হবে। কিন্তু মায়ের গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে (যা গোষ্ঠী বা গোত্র মালিকানার) কোন শরীয়ার নিয়ম খাটবে না। লক্ষণীয়, শুধুমাত্র ব্যক্তিমালিকানার সম্পত্তিতেই ইসলামিক শরীয়া বা পিতৃতান্ত্রিক আইন ব্যবহারযোগ্য হচ্ছে। কিন্তু সামষ্টিক মালিকানার সম্পত্তির ক্ষেত্রে মিনাংকাবাউ গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রথা বা মাতৃ-অধিকারের প্রথাই ব্যবহৃত হচ্ছে।

মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি সমাজেই একটা ভিত্তি কাঠামো থাকে, যার উপর নির্ভর করে উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে। যেমন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল একটা সমাজের ভিত্তি কাঠামো যার উপর নির্ভর করে সংস্কৃতি, প্রথা, আইনসহ বিভিন্ন উপরিকাঠামো গড়ে ওঠবে। একইভাবে ব্যক্তিমালিকানা নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরিকাঠামো হিসাবে গড়ে ওঠেছে পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি।

দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপত্তির ফলে নারীর মাতৃ-অধিকার উচ্ছেদ হল। সেই সাথে ব্যক্তি, পরিবার ও যৌন জীবনেও নারী অবদমিত অবস্থায় চলে গেল। সম্পত্তির মালিকানার উপর দাঁড়িয়ে পুরুষ সমাজ ও পরিবারে যে সাংস্কৃতিক ক্ষমতা বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল, সেটাকেই আমরা পুরুষতন্ত্র নামে চিনি। এই প্রথায় পিতার সম্পত্তির মালিকানা যেহেতু সুনির্দিষ্ট নারীগর্ভের সন্তানেরাই পাবে, তাই নারীকে বাধ্যতামূলকভাবে একগামী থাকতে হল। পুরুষের এই বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন পড়ল না। তাই পুরুষের যৌনবাসনা পূরণের জন্য পতিতাবৃত্তির পেশা সৃষ্টি হল।

সভ্যতা যতই বিকশিত হতে থাকল ব্যক্তিমালিকাধীন সমাজ বা রাষ্ট্রগুলোতে কখনও সামাজিক প্রথা, কখনও ধর্মীয় প্রথার আবরণে পুরুষতান্ত্রিক আগ্রাসনে নারীর অবস্থাও শোচনীয় হতে থাকল। বিবিধ বিধি-নিষেধের জালে নারীকে আটকে ফেলা হতে লাগল। সামন্ত বা মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশে নারীদের ভয়াবহ দুরবস্থার কাহিনী সবারই জানা।

কালক্রমে পুঁজিবাদের আগমন ঘটল। বিপুল পণ্য উৎপাদনের স্বার্থে তথা পুঁজির স্বার্থে কারখানাগুলোতে প্রচুর শ্রমিকের চাহিদা দেখা দিল, যা শুধুমাত্র পুরুষ দ্বারাই মেটানো সম্ভব ছিল না। ফলে সস্তা শ্রমিক হিসাবে নারী এমনকি শিশুদেরও কারখানায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়ল। পুঁজিবাদ নারীকে গৃহ থেকে শ্রমিকরূপে বের করে আনল। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেল। এটা পূর্বের সামন্ত সমাজের তুলনায় নারীদের একটা ঐতিহাসিক অগ্রগতির সুযোগ দিল। পুঁজিপতিদের নির্মম শোষণ সত্ত্বেও কারখানার কাজের সুযোগ, নারীদের ন্যূনতম অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সুযোগ, শ্রমিক শ্রেণির নারীদের সাংস্কৃতিকভাবে এগিয়ে দিল। এই শ্রমিক শ্রেণির নারীরাই ইতিহাস সৃষ্টি করল।

১৮৫৭-র ৮ মার্চ নিউইয়র্কের সেলাই কারখানায় নারী শ্রমিকরা উপযুক্ত বেতন, উন্নত কর্মপরিবেশ ও দশ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনে নামে। আন্দোলন দমনে পুলিশ সেদিন হাজার হাজার নারী শ্রমিকের মিছিলে গুলি চালায়। এতে আহত ও গ্রেফতার হয় অসংখ্য নারী। ধারণা করা হয় নারী আন্দোলনের ইতিহাসে এটি ছিল প্রথম গুলি চালানোর ঘটনা। ফলে আন্দোলন আরও জোরদার হয়। পরবর্তীতে নারীর ভোটাধিকারের বিষয়টি আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে সামনে আসে। এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আসে ১৮৮৬ সালের মে দিবস। রচিত হয় শ্রমিক দিবসের ইতিহাস। আন্তর্জাতিক নারী দিবসেরও উদ্ভব এই ৮ মার্চের ঘটনা থেকেই। যদিও বর্তমানে বিভিন্ন ধারার পুঁজিবাদের স্বার্থের নারীবাদী এবং কর্পোরেটদের কারণে এই ইতিহাস এখন প্রায় ঢেকে দেওয়া হচ্ছে।

লক্ষণীয়, যে সময়ে শ্রমিক শ্রেণির নারীরা নিজেদের অর্থনৈতিক অধিকারের জন্য রাস্তায় নেমে পুলিশ তথা রাষ্ট্রের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, একই সময়ে উচ্চবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক পরাধীনতার শিকার নারীরা তখন পরনির্ভরশীল হয়ে ছিল।

শিকার হচ্ছিল নানা পুরুষতান্ত্রিক যাতনার।

এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক– ১৮৫৮ সাল, নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে মার্কস তখন নিয়মিত লিখছেন। এক সুপরিচিত অভিজাত পরিবারের বধূকে তার স্বামী অ্যাসাইলামে পাঠিয়েছেন। তা নিয়ে চলছে কানাকানি, ফিসফাস। মার্কস তাঁর কলামে ঘটনাটির উল্লেখ করলেন। লিখলেন, খোপে না ফেলতে পারলেই পুরুষমানুষ নারীকে পাগল ঠাওরায়। লিখলেন, স্বাধীনচেতা ভদ্রমহিলাকে তিনি চেনেন এবং মনে করেন তার মধ্যে পাগলামির বিন্দুমাত্র লক্ষণও নেই।

দেখা যাচ্ছে একদিকে নারী শ্রমিকেরা যখন আন্দোলন করছেন, অন্যদিকে অভিজাত গৃহবধূর স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য তাকে পাগল ঠাওরে অ্যাসাইলামে পাঠানো হচ্ছে। এই ঘটনারও

১৬৬ বছর পর ২০২৪ সালে ইরানে হিজাব না পরার কারণে হেনস্তার শিকার হওয়া এক নারী প্রতিবাদ হিসাবে প্রচলিত সমাজের নিয়ম ভেঙে অন্তর্বাস পরে রাস্তায় বের হলে সরকার তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠায়।

সময় বদলালেও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনও বদলায়নি। কারণ এই পুরুষতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হল ব্যক্তিগত মালিকানা নির্ভর সম্পত্তি ব্যবস্থা, যেটার এখনও বদল হয়নি।

পুঁজিবাদও তার ক্লাসিক্যাল যুগ পার হয়ে নিওলিবারেল যুগে প্রবেশ করেছে। এই যুগে মানুষের সমস্ত মৌলিক অধিকারই বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। ফলে সমস্ত শ্রেণির নারী-পুরুষই এসব 'অধিকার' ক্রয়ের জন্য এবং বাজারকে সচল রাখার জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে। ফলে দীর্ঘদিনের অনেক পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিও তৈরি হচ্ছে।

Man is provider− এই ধারণা আর বাস্তব পরিস্থিতিতে বিবেচ্য হচ্ছে না। একই পরিবারে নারী-পুরুষ দুই পক্ষকেই এখন কাজ করতে হচ্ছে। নারী আপাত অর্থে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও, পরিবারে এখনও তার মাতৃ-অধিকার না থাকায় পুরুষতান্ত্রিক নানা সংস্কৃতি, যেমন: সন্তান পালনের একক দায়, ঘরের কাজের একক দায়, যেকোন ক্ষেত্রে স্বামীর স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার চর্চাসমূহের ভেতর তাকে যেতে হচ্ছে। বিবাহ প্রথায় নারীকে তার নিজের বেড়ে ওঠার আপন সংসার ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন একটা সংসারে যেতে হচ্ছে (যেটাও একটা পুরুষতান্ত্রিক চর্চা) এবং সেখানে দ্বন্দ্বের মুখেও তাকে পড়তে হচ্ছে। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকার ফলে এবং নারী নিজেও এখন সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার সামর্থ্য অর্জনের ফলে পরিবারে নারীর আর অবলা হয়ে থাকার প্রয়োজন পড়ছে না। ফলে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর বিভিন্ন স্বার্থের এই সংঘর্ষজনিত জায়গা থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাও ঘটছে। একই সাথে পরিবর্তন ঘটছে পারিবারিক কাঠামোরও।

সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানায় পুরুষের আধিপত্য থাকলেও বর্তমানে নারীও যখন এই ব্যক্তিমালিকানার আধিপত্যে প্রবেশ করছে, স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে। তবে এসবের ফলে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো মোটেও হুমকির মুখে পড়ছে না। বৈবাহিক সম্পর্কে নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার সমীকরণ কাজ করে। এমনকি উচ্চ শ্রেণির বিবাহ-সম্পর্কেও নারী প্রলেতারিয়েতের ভূমিকা পালন করে। প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিমালিকানা তথা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নারীর প্রকৃত অর্থনৈতিক মুক্তিও যেমন সম্ভব না, তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতিরও উচ্ছেদ সম্ভব না। একই সাথে বিভিন্ন ধারার নারীবাদীদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় নারী সমাজের সমতার অধিকার ও ন্যায্যতার লড়াইয়ের যে পরম্পরা, সেটাই নারীকে পুরুষতান্ত্রিক বিভিন্ন জবরদস্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্ত জমিন দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে।

তবে লড়াইটা কেবল নারীর একার না। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার এই পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির নির্মম শিকার খোদ পুরুষও। তীব্র প্রতিযোগিতা ও অনিশ্চয়তার মুখে সম্পত্তি অর্জনের তাগিদে গোটা

এক জীবন অমানবিক পন্থার ভেতর যেতে হয় পুরুষকেও। সম্পত্তি অর্জনের এই প্রতিযোগিতামূলক যাত্রায় নারী-পুরুষ উভয়েই এখন মুখোমুখি সংঘাতমূলক অবস্থানে। এর ফলস্বরূপ দেশে ও দেশের বাইরে প্রায় সময় দেখা যায় নারীদের কর্মস্থলে অংশ না নেওয়ার জন্য নানা রকম মতবাদ।

একটা বৈষম্যহীন অর্থ ব্যবস্থার সংস্কৃতিই পারে পুরুষতান্ত্রিক এই সংস্কৃতি বিলুপ্তির শর্ত তৈরি করতে এবং নারী ও পুরুষ উভয়েরই মুক্তি ঘটাতে।

লেখক: এক্টিভিস্ট

সম্পত্তি বণ্টনে অসাম্য: কোন বিকল্পই কি নেই

অরিত্র আহমেদ

সত্তরের দশকে এক ড্যানিশ দম্পতি গ্রামবাংলার জীবনযাত্রার উপর 'Jhagrapur: Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh' শিরোনামে একটি বই লিখেছিলেন। সেই বইয়ে কুষ্টিয়া জেলার 'ঝগড়াপুর' ছদ্মনামের (আসল নাম বানাইপুকুর) একটি গ্রামের নারীদের উপর চলমান যৌন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণের ব্যাপারগুলো তারা সবিস্তারে তুলে ধরেছিলেন। তাদের মূল বক্তব্য ছিল নারীরা শোষিত হয় প্রধানত দুইভাবে– শ্রেণি হিসাবে ও নারী হিসাবে। শ্রেণিগত অবস্থানের কারণে দরিদ্র নারীরা এমন অনেক শোষণের শিকার হোন, যেগুলো থেকে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা অনেকাংশেই বেঁচে যান। ঠিক তেমনি শ্রেণিগত অবস্থানের কারণেই উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা এমন অনেক লিখিত ও অলিখিত নিয়মের বেড়াজালে আটকা পড়ে যান, যেগুলো থেকে সাধারণত দরিদ্র পরিবারের নারীরা কম-বেশি মুক্তই থাকেন। যেমন, বাংলাদেশের বহু দরিদ্র মেয়ে যে এখনও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে চলেছে কিংবা অনেক পরিবারেই যে মেয়েরা অপুষ্টির শিকার, তার মূল কারণ দারিদ্র্য। আবার বহু মধ্যবিত্ত পরিবারে শিক্ষিত গৃহবধূকে যে চাকরি করতে দেওয়া হয় না, তারও অন্যতম মূল কারণ ওই নারীর শ্রেণিগত অবস্থান। দরিদ্র নারীরা নেহাত পেট চালানোর জন্য হলেও ঘরের বাইরে বেরোতে বাধ্য হোন, যা মাঠে-ঘাটে-গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কিংবা চা বাগানের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়। এই নারীদের পক্ষে চাইলেও অনেক দেশাচার কিংবা ধর্মাচার মেনে চলা সম্ভব নয়। কারণ তাতে তাদের বেঁচে থাকাই মুশকিল হয়ে যাবে। কিন্তু এই দেশাচার-ধর্মাচারগুলোই দেখা যায় খুব শক্তভাবে চেপে বসে মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদের উপর। ফলে ইচ্ছা না থাকলেও অনেক নারীই শেষ পর্যন্ত সামাজিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন। তাহলে কি আমরা বলবো যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দরিদ্র নারীরা বেশি স্বাধীন? সেটা বলা সম্ভবত বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ টিকে থাকার বাধ্যবাধকতাকে স্বাধীনতা বলা অনুচিত। কিন্তু যে ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই সেটা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বেশি আরাম, আয়েশ ও নিরাপত্তার মধ্যে বাস করেও বহু মধ্যবিত্ত নারীই শেষ পর্যন্ত স্বাধীন মানুষ হিসাবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন না। তাদের লিঙ্গ ও

শ্রেণিগত পরিচয় মিলে-মিশে এমন এক খাঁচা তৈরি করে যার বাইরে হয় তারা বেরোতে পারেন না, নয়তো বেরোতে চান না।

আবার কিছু সমস্যা আছে সকল শ্রেণির নারীই যেগুলোর সম্মুখীন হচ্ছেন এবং 'নারী' বলেই এই সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদের। এসব ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, গ্রাম-শহর, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদাভেদ নেই বললেই চলে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য এরকমই একটি সমস্যা। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যেখানে নারীরা কোন-না-কোনভাবে এই বৈষম্যের মুখোমুখি হচ্ছেন না। নিতান্তই হতদরিদ্র পরিবারগুলোতে হয়তো এই সমস্যা অতো প্রকট নয়, কারণ জমি-জমাই যেখানে নেই সেখানে তার ভাগাভাগি নিয়ে ঝামেলা হওয়ারও কোন সুযোগ নেই। কিন্তু মোটামুটি অর্থ-সম্পত্তি আছে এমন মধ্যবিত্ত ও উঠতি মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্বিবাদে তাদের প্রাপ্য সম্পত্তি আদায় করতে পারেন না। অর্থাৎ বাংলাদেশের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী বাপ-মায়ের সম্পত্তির যতটুকু তাদের পাওয়ার কথা, ততটুকু পেতে গেলেও তাদেরকে অনেক কষ্ট-কসরত করতে হয়। অনেকে নিতান্ত হয়রান হয়ে সম্পত্তি লাভের আশাই ত্যাগ করেন। অনেকেই অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে মুখ বুজে থাকেন।

এই সমস্যার কারণ একাধিক এবং সেগুলোর আলোচনাও বেশ সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু যে প্রশ্নটি প্রায়শই এড়িয়ে যাওয়া হয় সেটা হচ্ছে, বাংলাদেশের উত্তরাধিকার আইন কতটুকু ন্যায্য? এই আইনের মাধ্যমে কি নারী সুবিচার পাচ্ছে? স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সরকারই তো নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সাম্য নিশ্চিত করার কথা বেশ জোরেশোরেই বলে আসছে। আমাদের সংবিধানেও নারী ও পুরুষের সমতার কথা একাধিকবার বলা হয়েছে। সংবিধান ও সরকারের এই ঘোষিত লক্ষ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের উত্তরাধিকার আইনের কি কোন সঙ্গতি আছে?

বাংলাদেশের সংবিধানের অন্তর্গত বিভিন্ন ভ্রান্তি ও অসঙ্গতির কথা গত পঞ্চাশ বছর ধরে কম-বেশি আলোচিত হয়ে আসছে। ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক দলগুলো সংস্কার ও সংশোধনের নামে সংবিধানকে বারবার ইচ্ছে মতো দলাই-মলাই করেছে এবং এখনও করে চলেছে। সেটা অন্য আলোচনার ব্যাপার। এখানে আমরা নারীর সমানাধিকারের প্রশ্নে সংবিধান ও রাষ্ট্রের দ্বিচারিতার ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে চাই।

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের সংবিধানের চার মূলনীতির অন্যতম। ধর্মনিরপেক্ষতাকে যেহেতু সামাজিক ন্যায়বিচারের অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেহেতু জাতীয় ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিফলন থাকাটাই কাম্য। বাস্তবে সেটা আছে কি? নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে ফরহাদ মজহার ১৯৭২-এর আদি সংবিধান সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ভাষায়ই লিখেছিলেন, যে সংবিধানে বিবাহ-উত্তরাধিকার-সম্পত্তি বণ্টনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ধর্মের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেই সংবিধানকে আসলে ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায় না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, আদি সংবিধান প্রণেতারা কেন এই বিষয়গুলো ধর্মের উপর ছেড়ে দিলেন? বাংলাদেশ তো কোন ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র

নয়। এখানে শরীয়া আইন যেমন চলছে না, তেমনি মনুসংহিতা মেনেও রাষ্ট্র চালানো হচ্ছে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ আইনই প্রচলিত রয়েছে, সেখানে এই বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ধর্মের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেওয়ার কারণ কী? এর একটা কারণ অবশ্যই এই যে, ধর্মনিরপেক্ষতার যে ব্যাখা আমাদের দেশে দেওয়া হয় তা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অযথার্থ। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের দেশে নামে থাকলেও কাজে তেমন নেই। [রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা যথার্থ কি না বা কতটা যথার্থ, সেটা অন্য প্রশ্ন। এখানে সাংবিধানিক অসঙ্গতির বিবেচনাটাই মুখ্য।]

> **আমাদের সরকারগুলোর একটি বদভ্যাস হচ্ছে তারা এমনকি ন্যায্য কারণেও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে চটাতে চায় না। গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো অজস্র ক্ষতিকারক ও ড্রাকোনিয়ান আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করেছে। সেই সব আইনের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে ওঠলেও এবং বিভিন্ন মহল থেকে উত্তরোত্তর সমালোচনা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার কোন কিছুরই তোয়াক্কা করার প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু যখনই দেশের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে শক্ত অবস্থান নেওয়ার দরকার পড়ে তখনই সরকারগুলো রাতারাতি হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং ভোল পাল্টে ফেলে।**

এ কথা অস্বীকার করার কোন জো নেই যে, স্বাধীনতার পরে প্রথম সংবিধান প্রণয়নের সময়ই সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করার একটা বড় সুযোগ এসেছিল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার কেউ করেননি এবং সম্ভবত করতে চানওনি। আরও দুঃখের বিষয় হচ্ছে এরপর বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এসে একাধিক নারীনীতি প্রণয়ন করেছে, সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু উত্তরাধিকার আইনের কোন সংস্কার আজও করা হয়নি। ফলে সংবিধানের ২৮ (২) নং অনুচ্ছেদে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আমাদের উত্তরাধিকার আইন সেই প্রতিশ্রুতির সরাসরি লঙ্ঘন। কারণ ওই আইন যদি শতভাগও কার্যকর করা হয়, তবুও মুসলিম নারীরা সম্পত্তি পাবেন তাদের ভাইয়ের অর্ধেক। আর হিন্দু ও বৌদ্ধ নারীরা, শুনতে যত আশ্চর্যই লাগুক, কোন সম্পত্তিই পাবেন না। সংখ্যালঘু খ্রিস্টান নারীরা এদিক দিয়ে সৌভাগ্যবান, কারণ তাদের উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয় The Succession Act-1925 অনুযায়ী, যেখানে উত্তরাধিকারী হিসাবে নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদার অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীর সমানাধিকার লাভের পথে আইন নিজেই একটা বড় প্রতিবন্ধকতা।

আরও একটি বড় সমস্যা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা ও সৎ সাহসের অভাব। গত ত্রিশ বছরে বেশ কয়েকবার সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করার গুঞ্জন উঠলেও প্রত্যেকবারই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিবাদের মুখে যথাসময়ে আত্মসমর্পণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ১৯৯৭-এর কথা বলা যায়। এই নীতিমালার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল 'নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ঋণ-প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তিসহ ভূমির উপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা'। 'উত্তরাধিকার' শব্দটির উপস্থিতি সত্ত্বেও এই নীতিমালা যখন প্রণয়ন করা হয় তখন যে কারণেই হোক ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো তেমন কোন প্রতিবাদ করেনি। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আওয়ামী লীগ সরকার এরপর টানা চার বছর ক্ষমতায় ছিল, কিন্তু উত্তরাধিকার আইন সংস্কারের কোন উদ্যোগ তারা নেয়নি। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে বিএনপি সরকার এবং ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'উত্তরাধিকার' শব্দ বাদ দিয়েই নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে। বলাই বাহুল্য, কোন সরকারই ঝুঁকি নিতে চায়নি। অতঃপর ২০১১ সালে আবারও গুঞ্জন শোনা যায় নতুন নারী উন্নয়ন নীতিমালার মাধ্যমে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করা হবে। কিন্তু ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর অব্যাহত প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মুখে সেবারও আওয়ামী লীগ সরকার শেষ পর্যন্ত ভোল পাল্টে ফেলে। ঠিক একই জিনিস দেখা গেছে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংস্কারের ক্ষেত্রেও। হিন্দু সমাজেরই একাংশ দীর্ঘদিন ধরে এই আইন সংস্কারের দাবি তুলে আসলেও কোন সরকারই এই আইন সংস্কারের উদ্যোগ নেয়নি। কারণ যখনই সংস্কারের কথা উঠে, তখনই হিন্দু সমাজেরই অপর একটি রক্ষণশীল অংশ সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়।

আমাদের সরকারগুলোর একটি বদভ্যাস হচ্ছে তারা এমনকি ন্যায্য কারণেও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে চটাতে চায় না। গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো অজস্র ক্ষতিকারক ও ড্রাকোনিয়ান আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করেছে। সেই সব আইনের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে ওঠলেও এবং বিভিন্ন মহল থেকে উত্তরোত্তর সমালোচনা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার কোন কিছুরই তোয়াক্কা করার প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু যখনই দেশের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে শক্ত অবস্থান নেওয়ার দরকার পড়ে তখনই সরকারগুলো রাতারাতি হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং ভোল পাল্টে ফেলে। এর কারণ আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতায় ও কর্মকাণ্ডে গণতান্ত্রিকতার অভাব থাকলেও জনতুষ্টিবাদী আচরণের ক্ষেত্রে কেউ কারও থেকেই পিছিয়ে নেই। এর আরেকটি বড় প্রমাণ হল CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979) সনদ অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দ্বিচারিতা। বাংলাদেশ CEDAW সনদে স্বাক্ষর করলেও ওই সনদের ২ টি ধারা বাংলাদেশে অনুমোদিত হয়নি। এখানেও সেই একই কাসুন্দি। রাষ্ট্রের বক্তব্য হল, সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দিতে চায় না। তাই বিবাহ, বিচ্ছেদ ও সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করার কোন আগ্রহ রাষ্ট্রের নেই। অথচ Universal Declaration on Human Rights, 1948 অনুযায়ী ওই দুই ক্ষেত্রেই পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার

ভোগ করার কথা (১৬ নং ও ১৭ নং ধারা)। বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে আলোচনা-সমালোচনা কম হচ্ছে না। কিন্তু নারীর সমানাধিকারের প্রশ্নে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে আচরণ তা-ও যে মানবাধিকারেরই লঙ্ঘন, এ কথা বলার লোক বাংলাদেশে খুব বেশি নেই।

> **খুব সহজ ভাষায় বললে রাজনৈতিক দলগুলো ভয় পায় আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোকে। এবং ভয় পায় বলেই সময়ে সময়ে দুধ-কলা খাইয়ে এই কাঠামোকে প্রতিপালন করে এবং এর সুরক্ষা নিশ্চিত করে। পিতৃতন্ত্রকে চটিয়ে যদি দুটো ভোট বেশি পাওয়া যেত, তাহলে হয়তো দলগুলো নারীর সমানাধিকারের ব্যাপারে আরও একটু সক্রিয় হতো। কিন্তু সেই সম্ভাবনাও তো নেই।**

রাজনৈতিক দলগুলোর এই জনতুষ্টিবাদী আচরণের কারণ কী? কিংবা প্রশ্নটা যদি একটু অন্যভাবে করি, রাজনৈতিক দলগুলো আসলে কাকে ভয় পায়? কোন সেই শক্তি এবং সেই শক্তির গোড়া কোথায়? খুব সহজ ভাষায় বললে রাজনৈতিক দলগুলো ভয় পায় আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোকে। এবং ভয় পায় বলেই সময়ে সময়ে দুধ-কলা খাইয়ে এই কাঠামোকে প্রতিপালন করে এবং এর সুরক্ষা নিশ্চিত করে। পিতৃতন্ত্রকে চটিয়ে যদি দুটো ভোট বেশি পাওয়া যেত, তাহলে হয়তো দলগুলো নারীর সমানাধিকারের ব্যাপারে আরও একটু সক্রিয় হতো। কিন্তু সেই সম্ভাবনাও তো নেই। কারণ যে পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা-বিন্যাস মোতাবেক আমাদের সমাজ চলছে, সেখানে নারীর স্থান পুরুষের অনেক নিচে। নারীকে এখানে স্বাধীন কর্তাসত্তা মনে করা হয় না, এমনকি সক্ষম ও দায়িত্বশীল Civil Person হিসাবেও নারীকে বিবেচনা করা হয় না। শুধু তা-ই নয়, নারী যেন কিছুতেই Civil Person হয়ে ওঠতে না পারে, লিখিত ও অলিখিত বিভিন্ন বিধি-নিষেধ দিয়ে সেটা নিশ্চিত করা হয়। এই সমাজে নারী নিজেই বিনিময়যোগ্য সম্পত্তি। বিয়ের আগে সে থাকে পিতার অধীন, বিয়ের পরে তার মালিকানা বদল হয়ে চলে যায় স্বামীর কাছে। বিয়ের আগে নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার, বিয়ের পরে সেই দায়িত্ব বর্তায় স্বামীর ঘাড়ে। মোটা দাগে এই যেখানে নিয়ম, সেখানে নারীর পৈতৃক সম্পত্তিতে সমানাধিকারের প্রশ্ন তোলাই তো প্রায় বাতুলতার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। সম্পত্তি, বিশেষ করে ভূ-সম্পত্তির মালিকানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীকে যে ক্ষমতা এনে দিতে পারে, সেই ক্ষমতাকে পিতৃতন্ত্র যমের মতো ভয় করে। ফলে নারীর যে কোন অর্থনৈতিক ক্ষমতা নেই, ভরণ-পোষণের জন্য সে যে সব সময়ই কারও-না-কারও উপর নির্ভরশীল, এটাকেই এই সমাজ নারীর জন্য স্বাভাবিক ও সমুচিত বলে মনে করে। নারীর অসহায়ত্ব এবং নারীর বিনিময়যোগ্যতাকে এই সমাজ পবিত্রজ্ঞান করে। ফলে যখনই সম্পত্তিতে সমানাধিকারের প্রশ্ন ওঠে, তখনই জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তার বিরুদ্ধে এক পায়ে খাঁড়া হয়ে যায়। ধর্মের দোহাই যেমন দেওয়া হয়, তেমনি দোহাই দেওয়া হয় সামাজিক শৃঙ্খলা ও নানাবিধ প্রথার। এটা তো ঠিকই যে, নারী যদি আসলেই উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষের

সমান মর্যাদা পায় এবং প্রাপ্ত সম্পত্তিকে স্বাধীনভাবে খরচ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তো পিতৃতন্ত্র অতি অবশ্য মুখ থুবড়ে পড়বে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতার অভাব যে ভারতবর্ষে নারীকে পঙ্গু করে রেখেছে, সেটা এই অঞ্চলের বিদ্বজ্জনদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সেই ঊনিশ শতকেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সাম্য' (১৮৭৯) প্রবন্ধে হিন্দু উত্তরাধিকার নীতির সমালোচনা করে লিখেছিলেন–

"নারী-পুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্ব্বসমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। পুত্র কন্যা উভয়েরই এক ঔরসে, এক গর্ভে জন্ম; উভয়েরই প্রতি পিতা মাতার এক প্রকার যত্ন, এক প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু পুত্র পিতৃমৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাপানাদিতে ভস্মসাৎ করুক, কন্যা বিশেষ প্রয়োজনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দ্দক পাইতে পারে না। এই নীতির কারণ হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই উত্তরাধিকারী; সেটি এরূপ অসঙ্গত এবং অযথার্থ যে, তাহার যৌক্তিকতা নির্ব্বাচন করা নিষ্প্রয়োজন।"

সৌভাগ্যের কথা হল, The Hindu Succession Act, 1956-র মাধ্যমে ভারতের হিন্দু নারীরা সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে সমানাধিকার লাভ করেছেন। অর্থাৎ অন্তত আইনী স্বীকৃতি পেয়েছেন। বাংলাদেশে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ধর্মের উপর ছেড়ে দেওয়ার ফলে বাংলাদেশের হিন্দু ও বৌদ্ধ নারীরা সেটা পাননি। কিন্তু বঙ্কিম যাদের কথা লেখেননি, সেই মুসলিম নারীরা কি সুখে আছেন? উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তারাও কি যুগ যুগ ধরে বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন না?

আইনের বিষয়ে আমরা পরে আসবো। তার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মুসলিম নারীদের যতটুকু সম্পত্তি পাওয়ার কথা, ততটুকু কি তারা পান? উত্তর হচ্ছে, না, অধিকাংশ নারীই পান না। যারা পান, তাদেরও একটা বড় অংশই বাপের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দীর্ঘ বিবাদ ও দর কষাকষির পর তাদের প্রাপ্য সম্পত্তি আদায় করেন। গোলমালটা বাঁধে এখানেই। ধর্মেই যখন নারীকে সম্পত্তির ভাগ দিতে বলা হচ্ছে, তখন বাংলাদেশের বহু 'ধর্মপ্রাণ' মুসলমান পুরুষ সুযোগ পেলেই বোনের সঙ্গে বেইমানি করেন কেন? বোন তার জমির অংশ বিক্রি করতে চাইলে বাপের বাড়িতে তোলপাড়ই-বা বেঁধে যায় কেন? আগেই যেমন বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এমন মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা খুব বেশি নয়, যেখানে জমি-জমা নিয়ে ভাইদের সঙ্গে বোনের কোন-না-কোন বিবাদ চলছে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বোনেরা জমির দাবি তুললেই ভাইয়েরা তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা শুরু করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় জমি বণ্টনের সময় বোনকে পরিমাণে কম না দিলেও তার ভাগে এমন জমি দেওয়া হয়, যার মূল্য বা উপযোগিতা তুলনামূলকভাবে কম। ভালো ভালো জমিগুলো ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যেই রেখে দেয়। আবার দেখা যায় কোন বোনের যদি ধনী পরিবারে বিয়ে হয়, তো সে জমির দাবি করলেই তার পরিবারের কথা তুলে তাকে খোঁটা দেওয়া হয়। 'তোমাদেরকে তো ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়েছি। তাহলে তোমরা জমি চাইতে আসো কেন?' ধরনের বিব্রতকর প্রশ্ন করা হয় তাকে। তবে এসবের চেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে যখন কোনভাবেই প্রাপ্য জমি আদায় করা

“

এই যে আমাদের সমাজ চাইছে নারী আত্মত্যাগী হোক, ভালো মানুষ হোক, মুখ বুজে বঞ্চনা সহ্য করুক, কিংবা তার ন্যায্য দাবির কথা মুখ ফুটে না বলুক– এইটা নারীদের জীবনের অনেক দুর্দশার একটা মুখ্য কারণ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতিটি নারীই জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে সমাজের নানাবিধ প্রত্যাশার এই চাপ অনুভব করে এবং কোন-না-কোন জায়গায় এই চাপের মুখে আত্মসমর্পণ করে। তাতে ক্ষতি হয় নিজের, কিন্তু লাভবান হয় পুরুষতন্ত্র।

সম্ভব হয় না, এমনকি তখনও ভাইদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা অধিকাংশ নারীই ভাবতে পারেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা এই বঞ্চনা মেনে নেন কিংবা পারিবারিক পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক সালিশ-বিচারের সাহায্য নেন, যাতে আসলে কাজের কাজ কিছু হয় না। এর কারণ তারা সমাজের চোখে খারাপ কিংবা স্বার্থপর হতে চান না কিংবা বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে চান না। যেহেতু কারণে-অকারণে সেখানে তাদের যাওয়া লাগে।

এই যে আমাদের সমাজ চাইছে নারী আত্মত্যাগী হোক, ভালো মানুষ হোক, মুখ বুজে বঞ্চনা সহ্য করুক, কিংবা তার ন্যায্য দাবির কথা মুখ ফুটে না বলুক– এইটা নারীদের জীবনের অনেক দুর্দশার একটা মুখ্য কারণ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতিটি নারীই জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে সমাজের নানাবিধ প্রত্যাশার এই চাপ অনুভব করে এবং কোন-না-কোন জায়গায় এই চাপের মুখে আত্মসমর্পণ করে। তাতে ক্ষতি হয় নিজের, কিন্তু লাভবান হয় পুরুষতন্ত্র। এইখানে আমাদের সেই বিখ্যাত ভায়োলিন বাদক ও গুড সামারিটানের (Good Samaritan) উপমার কথা মনে পড়ে যেতে পারে। আমেরিকান দার্শনিক জুডিথ জার্ভিস থমসন তার ‘A Defense of Abortion’ প্রবন্ধে গর্ভপাতের ক্ষেত্রে নারীকে যে নৈতিক দোলাচলে ঠেলে দেওয়া হয়, সেটা বোঝানোর জন্য এই উপমা দুটি ব্যবহার করেছিলেন। ধরা যাক, আপনি একদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে জেগে ওঠে দেখলেন আপনি এক বিখ্যাত ভায়োলিন বাদকের সঙ্গে পিঠাপিঠি ঘুমিয়ে রয়েছেন। ভায়োলিন বাদক অজ্ঞান। আপনি খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, মিউজিক লাভার সোসাইটি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানতে পেরেছে যে তার কিডনিতে খুব ভয়ানক কোন সমস্যা হয়েছে এবং কেবল আপনার রক্তের সঙ্গেই তার রক্ত ম্যাচ করে। আপনি যেহেতু তার বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য সেহেতু সঙ্গীতানুরাগীরা আপনাকে অপহরণ করেছে এবং আপনার দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছে ভায়োলিন বাদকের দেহ যাতে আপনার কিডনির সাহায্য নিয়ে তার দেহের বিষাক্ত পদার্থগুলো নিষ্কাশন করা যায়। নয় মাস এইভাবে চললে ভায়োলিন বাদক বেঁচে যাবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই নয় মাস ধরে আপনাকে যাবতীয় ভোগান্তি ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।

এখন আপনার করণীয় কী? আপনি কি নিজের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়াকে প্রাধান্য দেবেন? নাকি ওই বিখ্যাত ভায়োলিন বাদকের জীবন বাঁচাবেন? আপনি যদি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে

চান সেক্ষেত্রে আপনার দেহ থেকে ভায়োলিন বাদকের দেহ বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। যার অর্থ হচ্ছে ওই ভায়োলিন বাদক আর বাঁচবেন না। আপনি কি তার 'হত্যাকারী' হতে চান? নাকি আপনার উচিত বাইবেলে বর্ণিত গুড সামারিটানের (Good Samaritan) মতো নিজের জীবনকে অগ্রাহ্য করে ভায়োলিন বাদকের জীবন বাঁচানো? আপনার কি এক্ষেত্রে তার জীবন বাঁচানোর কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে? আপনি কি গুড সামারিটান হিসাবে আচরণ করতে বাধ্য? জুডিথ জার্ভিস বাটলার বলছেন, না, আপনি বাধ্য নন। Minimally Decent Samaritan হওয়াই আপনার জন্য যথেষ্ট। ঠিক তেমনি আপনি যদি নারী হোন এবং গর্ভধারণের ইচ্ছা না থাকলেও যদি আপনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন বা এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন গর্ভধারণ করলে আপনার ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি, সেক্ষেত্রে আপনার গুড সামারিটান হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। Minimally Decent Samaritan হয়ে যদি আপনি গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তো সেটা কোন অনৈতিক কাজ হবে না।

ভাববার বিষয়টা হচ্ছে, এই যে একজন নারীর কাছ থেকে আশা করা হচ্ছে তিনি গুড সামারিটান হবেন, এটা যে শুধু গর্ভপাতের সময়ই হয়ে থাকে তা নয়। বরং নারীর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নে পুরুষের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীর কাছ থেকেই বিনয় ও আত্মত্যাগ প্রত্যাশা করা হয়। সংসারের সুখের জন্য ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়েছে এমন নারীর যেমন অভাব নেই, তেমনি বাপের বাড়ির সঙ্গে ন্যূনতম সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য জমি-জমা ভাগাভাগির ক্ষেত্রে হাসিমুখে বঞ্চনা মেনে নিয়েছে এমন নারীরও অভাব নেই বাংলাদেশে। এই সামাজিক চাপের কারণে নারীরা মন খুলে তাদের দাবি-দাওয়ার কথা বলতে পারে না, আবার ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হলেও আইনের দ্বারস্থ হতে চায় না প্রায় কেউই। তার উপর নারীদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতির অভাবের ব্যাপারটা তো আছেই। অনেক পরিবারেই উত্তরাধিকারের প্রশ্নে নারীর দ্বৈত ভূমিকা দেখা যায়। একদিকে সে বাপের বাড়িতে ভাইদের সঙ্গে জমি-জমা নিয়ে গণ্ডগোল করে, কারণ সেখানে সে বঞ্চনার শিকার। আবার শ্বশুরবাড়িতে ননদরা যখন তাদের জমির দাবি নিয়ে হাজির হয়, তখন পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে সে-ও ননদদের ওপর চড়াও হয়। এই যে একদিকে যে শোষিত, আরেকদিকে তারই শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া, এটা নারীর ক্ষমতায়নের পথে একটা বড় বাধা। আমাদের সমাজে খুঁজলে এমন অনেক উচ্চশিক্ষিত নারীও পাওয়া যাবে যারা জমি-জমা নিয়ে নারীদের বেশি 'বাড়াবাড়ি' ভালো চোখে দেখেন না। দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর উপস্থিতি দিন দিন বাড়ছে, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এমন অনেক নেত্রী রয়েছেন এবং মিডিয়ায় ও পাঠ্যপুস্তকে নারীর ক্ষমতায়নের রোল মডেল হিসাবে প্রচার করা হয়। কিন্তু এই নেত্রীরা বাস্তবিক অর্থে কতটা কাজ করেন নারীদের জন্য? উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার কিংবা বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে তাদেরকে আমরা কখনও কথা বলতে দেখেছি? সমাজের প্রতিষ্ঠিত মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ দেখেছি আদৌ? খুব বেশি দূরে যাওয়া লাগবে না। ২০১১ সালে যখন নতুন নারী উন্নয়ন নীতি নিয়ে বিতর্ক উঠল, তখন সেই বিতর্ক সামাল দেওয়ার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ব্যারিস্টার শিরিন শারমিন চৌধুরী যেসব মন্তব্য করেছিলেন, তার উপর একটু চোখ বুলালেই আমরা বুঝতে পারবো এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ক্ষমতাধর নারী হিসাবে তারা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঠিক কতটা রুখে দাঁড়াতে পারেন বা রুখে দাঁড়াতে চান। অবশ্য প্রভাবশালী নারীদের দ্বিচারিতার কারণে কোন কিছুই থেমে থাকে না (বিলম্বিত হয় যদিও)। রাণী ভিক্টোরিয়া তো নারীদের ভোটাধিকারের বিপক্ষে ছিলেন। তাতে শেষ পর্যন্ত কী এসে গেছে?

সমাজের অবস্থা যখন এইরকম তখন রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ যে জনতুষ্টিবাদীই হবে, এতে আর অবাক হওয়ার কিছু থাকে না। তারচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, এরকম সমাজে কেবল আইন করে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর সম-মর্যাদা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা সেনেগালের কথা বলতে পারি। সেনেগালে আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান হলেও সেখানে খুব কম নারীই শেষ পর্যন্ত ভাইয়ের সমান জমি-জমা লাভ করতে পারে। এর কারণ সেখানেও দেশাচার, ধর্মাচার ও যাবতীয় সামাজিক প্রথা সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকারের বিপক্ষে।

তাহলে প্রশ্ন উঠবে আইন করেও যদি নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে আইনের সংস্কার নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে কথা বললেই তো হয়। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। কোন সমাজ ব্যবস্থায় মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটার অর্থ হল সেই সমাজের structure ও agency উভয়েরই পরিবর্তন ঘটা। উল্লেখ্য যে, structure বলতে একটা দেশের সামাজিক রীতি-নীতি, লিঙ্গ-কাঠামো, ধর্ম, প্রথা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়। যেহেতু মানুষ এই সম্মিলিত সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই বেড়ে ওঠে, সেহেতু সে এই কাঠামোর ভেতরে থেকেই চিন্তা ও আচরণ করতে শেখে। কাঠামোগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে থাকার ফলে অধিকাংশ মানুষ মনে করে বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোই আসলে শেষ কথা এবং এর ব্যতিক্রম হওয়া অনুচিত। অন্যদিকে agency বলতে বোঝায় একটা সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বাস করেও সেই কাঠামোর বাইরে গিয়ে ব্যক্তির স্বাধীনভাবে চিন্তা ও আচরণ করার ক্ষমতাকে। ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে যে, এক বা একাধিক ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কর্মকাণ্ড সেই সমাজের মানুষের আন্তঃসম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে থাকে। মানুষ তখন নতুনভাবে চিন্তা করতে আগ্রহী হয় যে কাঠামোর মধ্যে সে বাস করছে সেই কাঠামো আসলেই ন্যায্য কি না এবং এক পর্যায়ে মানুষ সমাজ কাঠামোয় মৌলিক পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ফলে স্ট্রাকচার বা এজেন্সি কোনটাই একে অপরের ঊর্ধ্বে নয় বরং তারা মূলত একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এখন কথা হচ্ছে কোন দেশের লোকাচার, দেশাচার, মানবিক আন্তঃসম্পর্ক ও সামাজিক ক্ষমতা বিন্যাস সেই দেশের আইন-কানুন ও শাসন-প্রশাসনকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি দেশের আইন-কানুনও সেই দেশের মানুষের আচার-আচরণ ও আন্তঃসম্পর্ককে কম-বেশি প্রভাবিত করে। ফলে সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের লড়াইয়ে রাষ্ট্রীয় আইন যখন এজেন্সির পক্ষে থাকে তখন পরিবর্তনকামী মানুষের পক্ষে তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরা আরও সহজ হয় এবং সমাজের অনেক নিপীড়ন ও হেনস্তা থেকেও তারা মুক্তি পান।

তাই বলে আইন হয়ে গেলেই সব হয়ে যাবে, এ কথা কেউই বলে না। সামাজিক পরিবর্তন একটা জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার। কিন্তু যথাযথ আইনের অভাব অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ সংস্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বিদ্যমান আইনের দোহাই দিয়ে কিংবা আইন না থাকার সুযোগ নিয়েই তখন শোষণ ও অবিচার চলতে থাকে। এইখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতের বর্ণপ্রথার কথা বলা যেতে পারে। বর্ণপ্রথা এখনও ভারতে একটা বড় সমস্যা। কিন্তু বৈষম্য-নিরোধক আইন যদি না থাকতো, আম্বেদকর যদি নিচু বর্ণের মানুষদের নাগরিক অধিকার নিয়ে লড়াই না করতেন, নিচু বর্ণের মানুষেরা আজ যতটুকু মর্যাদা পাচ্ছে, বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যতটুকু অংশগ্রহণ করতে পারছে, ততটুকুও হয়তো সম্ভব হতো না। এটাই বাস্তবতা।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাজার বাধা-বিপত্তির পরও নারীরা এখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে এবং পরিবারের ভরণ-পোষণে অবদান রাখছে। শিক্ষিত নারীরা তো বটেই, এমনকি গ্রামের সাধারণ শ্রমিক নারীরা কিংবা নগরবাসী গার্মেন্টস কর্মীরাও সংসার চালানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। সুতরাং নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের, এই যুক্তি দিয়ে আজকের পরিবর্তিত বাস্তবতায় নারীকে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি দেওয়াটা ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। তাছাড়া নাগরিক হিসাবে এটা নারীর অধিকারও বটে। নারীবাদী দার্শনিক লুস ইরিগারে তাঁর Thinking the Difference বইয়ে নারীর civil identity formation নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নারী তখনই সিভিল পার্সন হয়ে ওঠবে যখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অধিকার এবং অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব নারীর থাকবে। অর্থনৈতিক সক্ষমতা ছাড়া কি সেটা সম্ভব? নারী যদি সারা জীবনই কারও না কারও অভিভাবকত্ব মেনে বাস করতে থাকে, ভরণ-পোষণের জন্য কারও না কারও উপর নির্ভর করে থাকে, তো শেষ পর্যন্ত তার মর্যাদাও হবে অর্ধ-নাগরিকের মতোই (সর্বোপরি নারী তো অর্ধাঙ্গিনী মাত্র!)। সুতরাং, সমাজের চোখে যতো হঠকারীই মনে হোক না কেন, সম্পত্তিতে সমানাধিকার আসলে নারীর সিভিল আইডেন্টিটি গঠনের এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

অবশ্য কেবল অধিকার থাকলেই হবে না। সম্পত্তি আদায়ের পর সেই সম্পত্তির ব্যবহারের উপর নারীর নিয়ন্ত্রণ আছে কি না (অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রী তার সম্পত্তি স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে খরচ করতে পারেন না, বরং স্বামীই মালিক বনে যান) সেটাও দেখতে হবে। কারণ অধিকারের সঙ্গেই আসে দায়িত্ব। সুতরাং সম্পত্তিতে সমানাধিকার তো বটেই, যেকোন অধিকারই যাতে পার্লামেন্টের সংরক্ষিত নারী আসনের মতো নেহাত অলংকারে পরিণত না হয়, সেটাও দেখতে হবে। কারণ অধিকার নারীর ভূষণ নয়, অধিকার নারীর প্রয়োজন। লুস ইরিগারে যেমন লিখেছিলেন, "Women's lack of civility derives from the fact that they do not demand rights that are appropriate to them." কিছুক্ষণ পর ইরিগারে লিখছেন, "Men are too uncivil as a result of too many rights and too few duties, and women as a result of too few rights and too many duties..."। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে পুরুষ তথা পুরুষতন্ত্রের Uncivil আচরণ সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

তথ্যসূত্র

১. Jenneke Arens & Jos van Beurden, 1977, Jhagrapur: Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh, Amsterdam

২. Jenneke Arens, 2014, Women, Land and Power in Bangladesh: Jhagrapur revisited. The University Press Limited

৩. Judith Jarvis Thomson, 1971, A Defense of Abortion, Philosopher and Public Affairs

৪. Luce Irigaray, 2001, Thinking the Difference: For a Peaceful Revolution, The Athlone Press, London

৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৮, সাম্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা

৬. ফরহাদ মজহার, ২০১৪, সংবিধান ও গণতন্ত্র, আগামী প্রকাশনী

লেখক: কবি, অনুবাদক

গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে উত্তরাধিকার আইন সংস্কার প্রশ্নে

রাবেয়া মুহিব

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম। বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য বিরাজমান। আমাদের দেশে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য স্বাধীনতার এত বছর পরেও দূর হয়নি। এমনকি নারীকে তার সক্ষমতার চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অমর্যাদাকর উত্তরাধিকার আইনও সংস্কার হয়নি। নারীকে তার ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য অন্তত '২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন সংস্কারের প্রশ্নটি একটি জরুরি প্রশ্ন।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ কিংবা '২৪-এর রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থান এই অঞ্চলের মানুষের মানবিক মর্যাদা এবং সামজিক সাম্যের মতো মর্যাদাপূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুবৃহৎ আত্মত্যাগেরই গল্প। '৭১ কিংবা '২৪-এ মর্যাদাপূর্ণ নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে থাকার কথা ছিল সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্ন। '৪৭, '৭১ এবং হালের '২৪-এ বাংলাদেশের প্রায় সব আইনই প্রণীত হয়েছে অথবা সংস্কারের পরিকল্পনা করা হচ্ছে ইউরোপীয় সিভিল আইনের আদলে। দেশের সব নাগরিকের অধিকার রক্ষা এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে। শুধু নারী অধিকার খর্বকারী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আইন নিয়ে আলাপ হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে। অন্তত '২৪-এর রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক মুক্তি এবং রূপান্তরের এই সময়ে এমন দ্বৈত শাসন সংবিধান আমলে না নেওয়ারই শামিল।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১০, ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারাসমূহে জীবনের সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিতের অঙ্গীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই ধারাসমূহ কীভাবে আরও গণতান্ত্রিক, সাম্যের ও মর্যাদাপূর্ণ করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা জরুরি। তাই ধর্মীয় বিধান, শরীয়া আইন ইত্যাদির দোহাই দিয়ে নারী-পুরুষের এমন বৈষম্য মোটেও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে কাম্য নয়।

সংবিধানের ধারা ২৮-এর অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না'-এর অর্থ দাঁড়ায় সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে সংবিধান, রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নাগরিকের সমতার কথা বললেও উত্তরাধিকার ও সন্তানের ওপর কর্তৃত্বের বিষয়টি বিভিন্ন ধর্মের আইন দ্বারা পরিচালনার দোহাই দিচ্ছে। মূলত এই বৈষম্য যতটা না আইনের মূল উৎসের কারণে তারচেয়ে অনেক বেশি উৎসের আক্ষরিক, প্রেক্ষাপটহীন ও স্বার্থবাদী ব্যাখ্যার কারণে।

জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর সিডও সনদ বা নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য নিরসন সনদ গৃহীত হয়। সিডও সনদের দুটি ধারায় আমাদের বাংলাদেশ অনুমোদন করেনি। এর মধ্যে ২ নম্বর ধারায় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য নিরসনের জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আইন সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। ১৬.১ (গ) ধারায় বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও দায়িত্বের কথা বলা আছে। এই দুটি ধারা অনুমোদন না করার পেছনে আছে রাষ্ট্রের সেই পুরোনো যুক্তি। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক অংশীজনদের একটা অংশ মনে করেন, সিডও সনদের সম্পূর্ণ অনুমোদন দিলে তা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে।

অথচ রাষ্ট্রের অনান্য সকল বিষয়ে সব মানুষের জন্য একরকম নিয়ম আর পারিবারিক ক্ষেত্রে আরেক ধরনের নিয়ম চালু আছে। অর্থাৎ সরকারি নিয়মের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পার্থক্য নেই। যেমন: একজন নারী গাড়ি কিনতে গেলে যে পরিমাণ ভ্যাট দিতে হয় একজন পুরুষকেও তা-ই দিতে হয়, একজন হিন্দু অথবা মুসলিম ফৌজদারী অপরাধ করলে অথবা রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধায় একই নিয়মের অধীন হলেও পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে ধর্মের কথা তোলা হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে গণতন্ত্রায়নের ফলে উত্তরাধিকার আইন আধুনিকায়ন করা হয়েছে। যেমন: তুরস্ক, তিউনিশিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া। তিউনিশিয়ায় এক সময় ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন করা হতো। যেখানে নারী পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি পেত। কিন্তু দীর্ঘ আন্দোলন ও জনমতের চাপের ফলে ২০১৮ সালে তিউনিশিয়ার পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, যা নারীদের সম্পত্তিতে সমান অধিকার দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। তুরস্কে ১৯২৬ সালে শরীয়া আইন বাতিল করে সিভিল কোড প্রবর্তন করা হয়। এই কোড অনুসারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিবাহিত অবস্থায় অর্জিত সম্পত্তিতে সমান অধিকারী হোন। এছাড়া মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াতেও পারিবারিক আইনের সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

হিন্দু আইনের ক্ষেত্রেও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিন্দু ধর্মালম্বীদের দেশ ভারত ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংস্কার করে পিতা-মাতার সম্পত্তিতে ছেলেমেয়ে উভয়ের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও হিন্দু নারীরা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহ সম্পর্কিত আইনে সমানাধিকার পেয়ে থাকেন।

ধর্মীয় বিধানের দোহাই দিয়ে উত্তরাধিকার আইনে বৈষম্য মূলত সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থপরতারই বহিঃপ্রকাশ। নাগরিকদের একাংশের প্রতি এই বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়ন ও মর্যাদাপূর্ণ নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রধান অন্তরায়।

গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী রাষ্ট্রের আইন হওয়া উচিত ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার জন্য সমান। এজন্য রাষ্ট্রের একটি সর্বজনীন সিভিল কোড প্রণয়ন জরুরি। এবং এর পাশাপাশি কোন নাগরিক যদি ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী সম্পত্তি নিতে চান, তাহলে সে সুযোগও রাখা উচিত আইনে। কিন্তু কোনভাবেই কোন কিছুর দোহাই দিয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষের বৈষম্য গ্রহণযোগ্য নয়। তা না হলে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার সাম্য ও নায্যতার বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে না।

লেখক: শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

স্যোশাল মিডিয়া খণ্ডচিত্রে এপ্রিল ’২৪

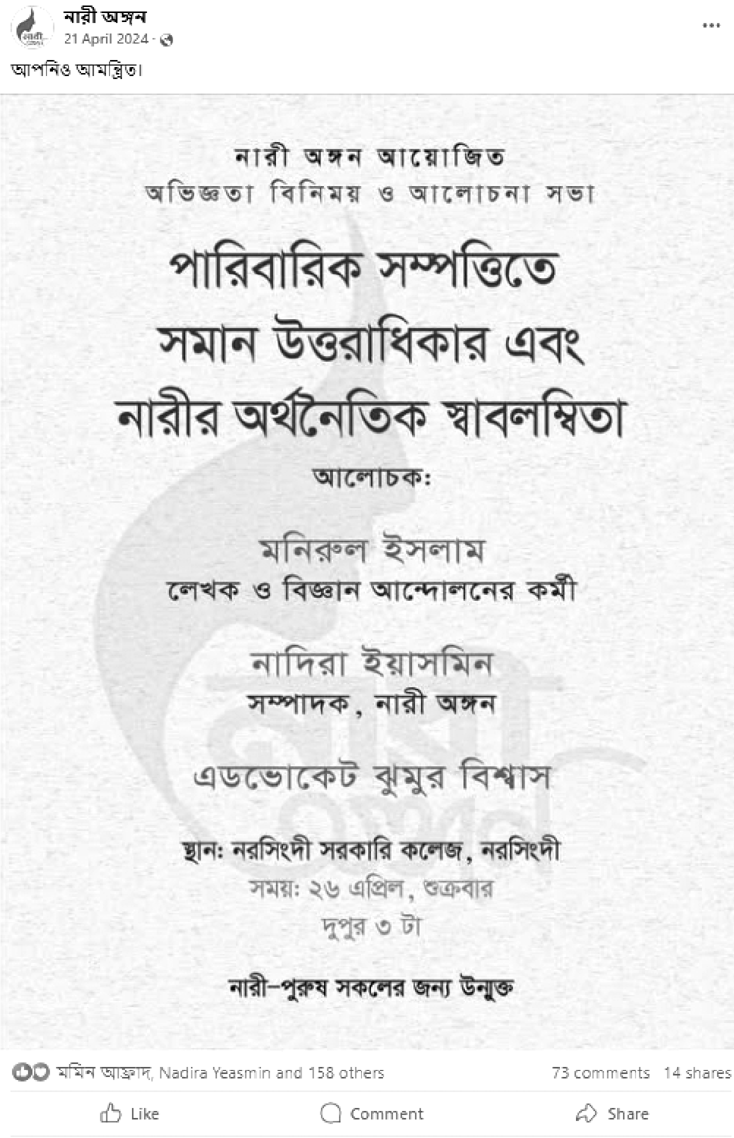

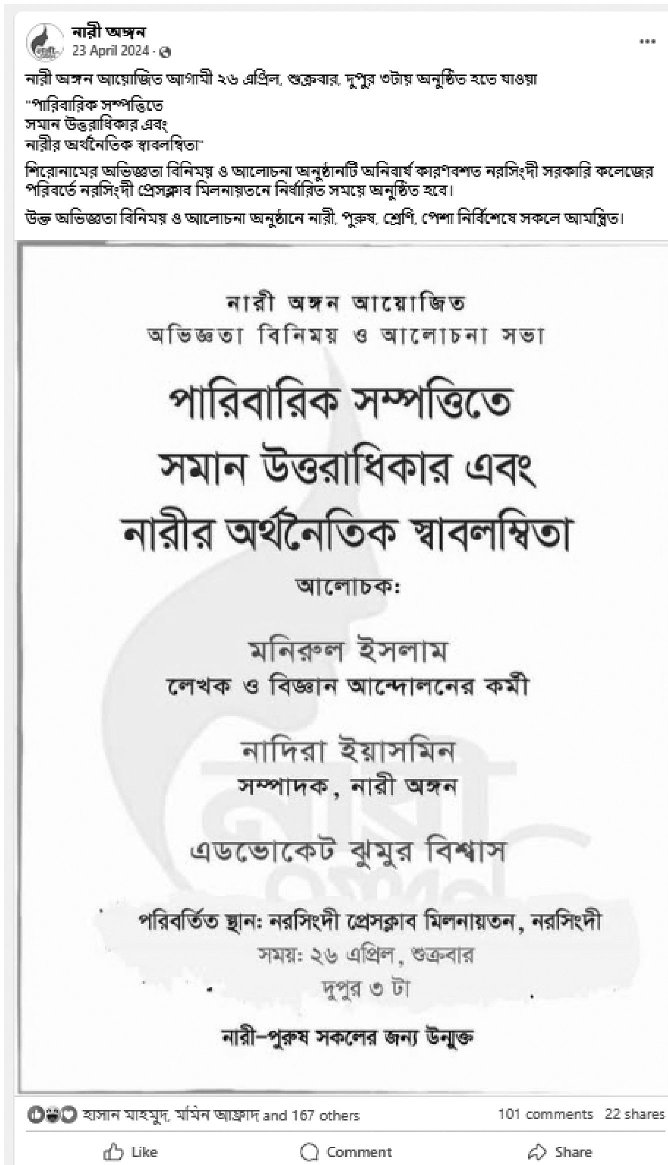

নারী অঙ্গন
23 April 2024 ·

নারী অঙ্গন আয়োজিত আগামী ২৬ এপ্রিল, শুক্রবার, দুপুর ৩টায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া

"পারিবারিক সম্পত্তিতে
সমান উত্তরাধিকার এবং
নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা"

শিরোনামের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা অনুষ্ঠানটি অনিবার্য কারণবশত নরসিংদী সরকারি কলেজের পরিবর্তে নরসিংদী প্রেসক্লাব মিলনায়তনে নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা অনুষ্ঠানে নারী, পুরুষ, শ্রেণি, পেশা নির্বিশেষে সকলে আমন্ত্রিত।

নারী অঙ্গন আয়োজিত
অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা সভা

পারিবারিক সম্পত্তিতে
সমান উত্তরাধিকার এবং
নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা

আলোচক:

মনিরুল ইসলাম
লেখক ও বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী

নাদিরা ইয়াসমিন
সম্পাদক, নারী অঙ্গন

এডভোকেট ঝুমুর বিশ্বাস

পরিবর্তিত স্থান: নরসিংদী প্রেসক্লাব মিলনায়তন, নরসিংদী
সময়: ২৬ এপ্রিল, শুক্রবার
দুপুর ৩ টা

নারী-পুরুষ সকলের জন্য উন্মুক্ত

হাসান মাহমুদ, মমিন আক্রাদ and 167 others 101 comments 22 shares

Like Comment Share

নারী অঙ্গন
24 April 2024 ·

পারিবারিক সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকারের আমাদের যে দাবি সেটা কোন ধর্মের কাছে নয়, রাষ্ট্রের কাছে। কারণ রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সম-অধিকার ও সম-সুযোগ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

মমিন আফ্রাদ and 60 others   20 comments   2 shares

Like   Comment   Share

নারী অঙ্গন
26 April 2024 ·

আলোচনা সভা করতে বাধাদানের বিরুদ্ধে
নারী অঙ্গন এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

আজকে নরসিংদীতে 'পারিবারিক সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা' শিরোনামে 'নারী অঙ্গন' এর একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা সভা আয়োজন করার কথা ছিল। সেজন্য প্রথমে নরসিংদী সরকারি কলেজ এবং পরে নরসিংদী প্রেসক্লাব মিলনায়তন অনুমোদন নেয়া হয়েছিল। কিন্তু দুই জায়গা থেকেই 'ধর্ম অবমাননার অভিযোগ' এনে আমাদের অনুমোদন উইথড্র করে নেয়া হয়েছে।

আমাদের অবস্থান নিয়ে ধর্মীয় বিরোধিতা থাকতে পারে।
সেক্ষেত্রে বিরোধীদের সামনে দুইটা পথ খোলা ছিল।

১) সভায় নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানো, যিনি এই বিষয়ে ধর্মীয় অবস্থান থেকে যুক্তিমালা তুলে ধরবেন।

২) নারী অঙ্গনের সভার বিরুদ্ধে পাল্টা সভা করা। যেখানে ধর্মেই যে পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীর ন্যায্য উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা কেন ধর্মবিরোধী তার পক্ষে ধর্মীয় অবস্থান থেকে যুক্তিমালা তুলে ধরা যেতো।

মানুষ নারী অঙ্গনের বক্তব্য শুনতো, তাদেরটাও শুনতো।
এরপর নিজেরাই ঠিক করতো, কোনটা গ্রহণ করবে।

এটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

বিরোধীরা কী করেছেন?

নারী অঙ্গন এর অন্যতম কর্মী নাদিরা ইয়াসমিন এর বিরুদ্ধে জেলার সাধারণ মানুষজনকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন, যারা নরসিংদী সরকারি কলেজ গেটে নাদিরা ইয়াসমিনের অপসারণ চেয়ে 'প্রতিবাদ সমাবেশ' করেছেন। দুই জায়গাতেই অনুষ্ঠান যাতে না করা যায় সেজন্য ভেন্যুর অনুমোদন বাতিল করানো হলো। শুধু তা-ই না, অনুষ্ঠান নরসিংদীর কোথাও যাতে না করা যায়, সেই উত্তেজনা ছড়িয়ে দিলো সর্বত্র। গত কয়েক দিন যাবৎ অনলাইনে চূড়ান্ত মাত্রায় সাইবার বুলিং চালানো হচ্ছে নাদিরা ইয়াসমিন এর বিরুদ্ধে।

বুঝাই যাচ্ছে, তারা অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনায় বিশ্বাস করেন না। ধর্মের নামে উত্তেজনা সৃষ্টি করায় বিশ্বাস করেন।

আমরা 'নারী অঙ্গন' এর পক্ষ থেকে এইসব কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানা
জানাই, আলোচনার পথ বেছে নেওয়ার জন্য। কারণ আমরা কেউই কারো প্রতিপক্ষ

নারী অঙ্গনের পক্ষ থেকে
সাবিনা শিকদার
২৬/৪/২৪

নারী অঙ্গন
4 May 2024 ·

প্রিয়
নারী অঙ্গন

তারা একটি আলোচনা থামিয়ে দিলো
অথচ শত শত আলোচনার জন্ম নিলো।

আচ্ছা,
মরা মানুষ কী বিবৃতি দেবে
তাদের তো কোন রাজনীতি নেই
তারা তো মরে গেছে আপনাদের গণদাবীর ভেতর।

ভোরের কুয়াশা কাটিয়ে আপনারা যে
আলোক-রশ্মি এনেছেন ধরায়
সে আলোয় বেঁচে উঠলো গৃহপালিত গাছ।

বাংলার জমিনে আছে
নর-নারীর সমান অধিকার

আপনাদের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে
কৃষাণীর দাওয়ায়
আপনাদের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে
পূবালী হাওয়ায়।।

নারী অঙ্গন প্যারাডাইম/ মমিন আফ্রাদ

মমিন আফ্রাদ and 15 others

Like   Comment

নারী অঙ্গন
28 April 2024

নারী অঙ্গন পাঠচক্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্ষোভ ও প্রতিবাদী বিবৃতি

গত, ২৬ এপ্রিল, শুক্রবার নারী অঙ্গন আয়োজিত "পারিবারিক সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা" শিরোনামে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা স্থগিত করতে বাধ্য করা হয়েছে।

আয়োজনের প্রচারণার পর থেকে নারী অঙ্গনের কর্মী নাদিরা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন, প্রতিক্রিয়াশীল এবং কিছু কুচক্রী গোষ্ঠী সাইবার বুলিং এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। নরসিংদীতে আয়োজিত নারী অঙ্গনের আলোচনাসভা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি করায় আমরা গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি।

আমরা বিশ্বাস করি, পরপর দুইটি ভেন্যু থেকে আলোচনা সভা বাতিল রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক রূপ প্রকাশ করে যা সংবিধান পরিপন্থী এবং নাগরিক অধিকারকে খর্ব করেছে। আলোচনাসভা বাতিল করায় এবং নাগরিক নিরাপত্তাদানে ব্যর্থ হওয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নারী অঙ্গন পাঠচক্রের প থেকে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি।

বার্তা প্রেরক,
সুমাইয়া শিকদার
সংগঠক নারী অঙ্গন পাঠচক্র
বিশ্ববিদ্যালয়।

নারী অঙ্গন
26 April 2024

নারী অঙ্গন পাঠচক্র, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্ষোভ ও প্রতিবাদী বিবৃতি

২৬ এপ্রিল, শুক্রবার, নারী অঙ্গন আয়োজিত "পারিবারিক সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা" শিরোনামের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ এবং নারী অঙ্গন জার্নালের সম্পাদক নাদিরা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে সাইবার বুলিং, ঘৃণা ছড়ানো, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাঁধা সৃষ্টি করায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি।

সংবিধানে বর্নিত নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী অঙ্গনের এই আয়োজনে বাঁধা সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে সংবিধান পরিপন্থী একটি কাজ। এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করার সামিল।

আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিশ্রুত বাংলাদেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন সমাজ নির্মিত হবে।

বার্তা প্রেরক,
ইমতিয়াজ আহমেদ
সংগঠক নারী অঙ্গন পাঠচক্র
ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়।

নারী অঙ্গন
27 April 2024

নারী অঙ্গন পাঠচক্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্ষোভ ও প্রতিবাদী বিবৃতি

২৬ এপ্রিল, শুক্রবার, নারী অঙ্গন আয়োজিত "পারিবারিক সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা"
শিরোনামের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এবং ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ ও নারী অঙ্গন জার্নালের সম্পাদক নাদিরা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে সাইবার বুলিং এবং ঘৃণা ছড়ানো এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাঁধা সৃষ্টি করায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমতার কথা বারবার ঘোষিত হয়েছে। স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে সমান মর্যাদা, অধিকার ও সুযোগের। শুধু তা-ই না, হাজার হাজার বছরের বঞ্চনার শিকার নারীদের সমাজের মূলধারায় যুক্ত করতে, ফিরিয়ে আনতে ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ বিশেষ সুযোগের অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। সংবিধানে নারীর অধিকার, সমতা ও সুযোগ নিশ্চিতের অঙ্গীকার করা হয়েছে,,

সংবিধানের তৃতীয় ভাগে, ২৭ ও ২৮ নাম্বার অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

এছাড়া সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা শিরোনামে বলা হয়েছে ৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

আমরা বিশ্বাস করি, নারী অঙ্গন আয়োজিত "পারিবারিক সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা" শিরোনামের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা অনুষ্ঠানে বাঁধা প্রদান পরিপূর্ণ ভাবে সংবিধান পরিপন্থী। যা বর্তমান রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপ উম্মোচিত করেছে। এমতাবস্থায় আমরা নারী অঙ্গন পাঠচক্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করছি।

বার্তা প্রেরক,
রাবেয়া মুহিব
সংগঠক নারী অঙ্গন পাঠচক্র
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মর্মিন আহ্লাদ, খাইরুল ইসলাম and 72 others · 4 comments · 1 share
Like · Comment · Share

নারী অঙ্গন
26 April 2024

গনতান্ত্রিক ছাত্র জোট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৬শে এপ্রিল, ২০২৪

নরসিংদী জেলায় নারী অঙ্গনের আয়োজনে বাধা সৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে চবি গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট

Nahida Ankhi and 36 others · 5 comments · 1 share
Comment · Share

নারী অঙ্গন
5 May 2024 ·

আমার বাবা আর চাচা দুই ভাই মিলে যে সম্পত্তি করেছিলেন, সেই সম্পত্তি চারভাই সমানভাগে ভাগ করে নিয়ে নিয়েছে। ভাইয়ের সম্পত্তিতে নাকি ভাই ভাগ পায়। অথচ একমাত্র ফুফুকে দেয়নি, বঞ্চিত করেছে। দাদার জমির ছোট এক অংশ তার নামে রাখা হয়েছে, যা উনি আজও হাতে পাননি। ফালতু অভিযোগে তাকে পরিবার থেকে দূরে রেখেছে। আমার মা নানার কাছ থেকে যে সম্পত্তি পেয়েছিলেন, তা আমার বড় দুই মামা অভাব দেখিয়ে মা ও বড় খালার কাছ থেকে লিখে নিয়েছে কৌশলে।

তাদের ছেলে মেয়েরা আজ প্রতিষ্ঠিত। অথচ আমার মা আজ নি:স্ব। আমার বাবার একমাত্র মেয়ে আমি। বাবা ও চাচা তাদের ছোট দুই ভাই ও তাদের ছেলে মেয়েকে লেখা পড়ার ব্যাপারে সর্বাত্মক হেল্প করেছেন। এমন কি এখনও করছেন। চাচাতো ভাইদের সবারই লেখাপড়া শেষ। ছোট চাচা ঢাকায় চারটা ফ্ল্যাট ও বাড়ির মালিক। অথচ বাবা বার্ধক্যে উপনীত হওয়ায় ছোট দুই চাচা ধর্ম অনুযায়ী ভাগ পায় বলে সম্পত্তি নিয়ে আবার ঝামেলা শুরু করেছে। শেষম্যাষ অবশিষ্ট যে বাড়িটিতে বাবা থাকেন, সেটিও জালিয়াতি করে ছোটজন নিজের নামে করে নিয়েছে। যারা কিছু না হতেই ধর্মকে নিয়ে আসেন, তাদের একজনও এসে বলেনি, যে বড় ভাই-ভাবি নিজের পরিবার ভুলে তোমাদের পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের প্রতি এই অন্যায়-অত্যাচার করা বিবেক-বর্জিত কাজ, ভাই-ভাতিজিকে ঠকানোর মতো ঘৃণ্য কাজ আমাদের ধর্মে কোথাও নেই। আমরা মুসলিম হিসেবে এই কাজ কখনোই করতে দেবো না। ফেরত দিন বাড়ি। উহু! একজন হুজুর কিংবা ধর্মবাদীও আসেননি আমাদের পক্ষে কথা বলার জন্য।

আমার শাশুড়িও তার বাবার একমাত্র মেয়ে ছিলেন। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর তার মামাতো ভাই তার মায়ের দেওয়া জায়গাটি দখল নিয়ে বসে আছে। ধার্মিকেরা কেউ আছেন? মাঠে আসেন প্রতিবাদ করার জন্য। আসবেন না। আসার কথাও না। কারণ এখানে নারী

তাই বলি, ধর্মকে নিজেদের স্বার্থের জন্য ব্যবহার ক

রোদেলা শিশির

মমিন আফ্রাদ and 43 others

Umme Farhana
26 April 2024 ·

মারিয়াম খান সম্পাদিত It's Not About the Burqa গ্রন্থের একটি প্রবন্ধের নাম The First Feminist, সেইখানে লেখক বলছেন যে উনার জানা প্রথম নারীবাদী হলেন বিবি খাদিজা।তিনি নিজের বিজনেস ঔন করতেন, নিজের পছন্দ অনুযায়ী নিজের চেয়ে বয়সে ছোট পুরুষকে বিবাহ করেছিলেন (দরিদ্র সেই পুরুষ মোটেও নবী বা নেতা হয়ে ওঠেননি তখনও) মোটকথা নিজের টার্মে নিজের জীবন যাপন করতেন। লেখক আরও বলেন পশ্চিমে একজন নারী ব্যাংক একাউন্ট রাখার অধিকার পেয়েছেন সবে দেড়শো বছর হয় আর ইসলাম নারীকে সম্পদের অধিকার দিয়েছে দেড় হাজার বছর আগে।
বাবার বাড়ি থেকে পাওয়া কিংবা মোহরে পাওয়া অর্থ গহনা অথবা রিয়েল এস্টেটের উপর নারীর পূর্ণ অধিকার, সে তা স্বামীকে দিয়ে দিতে বাধ্য নয়, এদিকে ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডেও বিবাহের পর নারীর সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদের মালিক অটমেটিক্যালি হতেন বিবাহিত নারীর স্বামী।

মরক্কোর সমাজবিজ্ঞানী ফাতেমা মারনিসি তাঁর Veil and the Male Elite গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে নবীর শেষ স্ত্রী আয়েশাকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য নারীনেতৃত্ব সম্পর্কে নেতিবাচক কথা প্রচার করেছে তখনকার ক্ষমতাসীন পুরুষেরা। উটের যুদ্ধ বা জাংগে জামালে আয়েশার শোচনীয় পরাজয়ের আগে ও পরে শেষ খলিফা আলীর অনুসারীরা আয়েশাকে নানানভাবে স্টিগমাটাইজ করেন এবং সহি বুখারিতে অন্তর্ভুক্ত আয়েশা বর্নিত সকল হাদিসকে ডিফাই করেন। আয়েশা ছিলেন উচ্চাভিলাষী, তাঁকে রাজনীতিতে আসতে না দেওয়ার জন্য তৎকালীন পুরুষুকূলকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। আয়েশা বলেছিলেন নারীর ঋতুস্রাব অপবিত্র কিনা তা নিয়ে নবী কী বলেছেন তা তো পুরুষদের জানবার কথা নয়, এগুলো জানি আমরা, নবীর স্ত্রীরা। আয়েশা আরও বলেন যে, নারীনেতৃত্বের জন্য জাতি ধ্বংস হয় এই হাদীস দেনেওয়ালা ব্যক্তি নিজেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে বেত্রাঘাত খেয়েছেন, তার বলা হাদীসের অথেন্টিসিটি নেই।

নারীনেতৃত্বের এই দেশে যারা ধর্মের নামে নারীকে ক্ষমতা থেকে ও সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চান তাঁদের প্রতি জিজ্ঞাসা, প্রধানমন্ত্রীকে জাতির পিতার লিগেসি রক্ষা করতে দিচ্ছেন কীভাবে আপনারা? একজন নারী যে দেশের হেড অব স্টেট সেই দেশে বসবাস করতে আপনাদের ধর্ম নষ্ট হয়না?

Nadira Yeasmin আপাকে নাস্তিক নারীবাদী ট্যাগ দিয়ে প্রতিহত করার অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

মমিন আফ্রাদ, Nadira Yeasmin and 124 others 5 comments 9 shares

Like Comment

নারী অঙ্গন
2 May 2024 ·

নারী অঙ্গন আয়োজন করেছিলো নারীর উত্তর
আলোচনা সভা। খেয়াল রাখতে হবে যে, ধর্মীয়
উত্তরাধিকার আইনের এবং পারিবারিক আইনে
জীবিত থাকা অবস্থায় পিতার মৃত্যু হলে নাতি স
সংস্কারের পর থেকে এই সম্পত্তি তারা পান। কি
সংস্কার। এই সংস্কার কার্যকর হয়ে বাঙালী বা এই
এমন কিছু আমাদের জানা নেই।

একই কথা প্রযোজ্য বিয়ের বয়স বিষয়ে বৃটিশ, পা
বাংলাদেশ আমলের বহু বিবাহ বিষয়ক আইন প্রস
আনেনি। বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খে
নিশ্চিত করা, মৃত্যু রোধ করা, নারীকে শিক্ষিত হবার
উন্নতি সাধনে ভূমিকা রেখেছে।

এমনকি, পুত্র সন্তান না থাকলে পিতার সম্পদে কন্যা
বাংলাদেশের বহু স্থানে কার্যত মান্য করা হয় না। কেন
বহু পরিবারের এখন কেবল একটি বা দুটি কন্যাই আ
বিধি টিকছে না। অন্যদিকে, আমার দেখা অজস্র পরিব
হয়। ফলে পুত্ররা এককভাবে দায়িত্ব নেন বলে বেশি অ
ফলে সঙ্গত কারণেই রাষ্ট্রীয় আইনে কিছু পরিবর্তনের দা
আর, সংস্কার বিষয়ক কোন আলোচনাকে তো কোন অব ... সেই দাবিগুলো অযৌক্তিক নয়।
উত্তরাধিকার সম্পদের বেলাতে কেউ যদি এমন সংস্কারের ... হতেই বন্ধ করাটা যৌক্তিক হতে পারে না।
করতে হবে কেন? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তো এই সব ভাবনারই স্থানে প্রস্তাব আনেন, তাকে হিংসাত্মক উপায়ে দমন
এই আলাপ বন্ধ করতে হবে? প্রেস ক্লাবের যেখানে হবার কথা বাক স্বাধীনতার অন্যতম পাহারাদারের ভূমিকা
পালনকারীর, সেখানে তারাও এই আলোচনাকে বন্ধ করেছে!

নাদিরা ইয়াসমিন ও তার সহকর্মী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। তাদের ভূমিকার কারণেই বিষয়টি আরও আলোচনায় আসছে। আশা করবো এই প্রশ্নগুলো বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্মাণে সামনের দিনে আরও বেশি বেশি করে আলোচনায় আসতে থাকবে।

Firoz Ahmed

মমিন আফ্রাদ and 20 others

Like Comment 6 comments 1 share

Share

Kamrul Hasan Roman is with **Nadira Yeasmin**.
27 April 2024 ·

নাদিরা ইয়াসমিন!
একজন সংগ্রামী নারী। আমি ২০১৯ সালে নরসিংদী সরকারি কলেজে ভর্তির সুবাদে ম্যাডামের সাথে পরিচয় হয়েছো ক্লাসে উনি লাল সালু'টা খুব সুন্দর করে পড়িয়েছেন। সে থেকেই ম্যাডামের ফ্যান আমি। স্টেশন, কলেজ ক্যাম্পাস, কলেজ গেট ম্যাডামের সাথে অসংখ্যবার দেখা হয়েছে কলেজ জীবন শেষ হওয়ার পরেও। উনি অন্যদের মতোনা। চাকরি বাঁচানোর জন্য সামান্য তোষামোদিও উনার অভিধানে নাই। তার সহকর্মীসহ অনেক স্টুডেন্টদের এটা অজানা নয়।

বিগত কিছুদিন যাবৎ একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে উনি যেভাবে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন তা নজিরবিহীন। বিশেষ করে উনার সরাসরি ছাত্র যারা তারাও বিভিন্ন গ্রুপে উনার ছবি ... করে যেভাবে পোস্ট, মিমস বানাচ্ছেন তা সত্যিই নিন্দনীয়, চরম অন্যায়ও বটে। একটা শি... বিভিন্ন পর্ন তারকার মুখে বসিয়ে মিম বানানো কি কোন প্রতিবাদের ধরন হতে পারে?

Nadira Yeasmin স্রোতের বিপরীতে চলা একজন সাধারণ ... ং রাস্তাঘাটে শারীরিক আক্রমণ করার জন্য উন্মুক হয়ে আছেন ...

মমিন আক্রাদ, Sabbir Hossa... comments

Like

Taniah Mahmuda Tinni
25 April 2024 ·

Nadira Yeasmin আপুর পোস্টে শুধু কমেন্ট করেছিলাম "আপু আপনি এগিয়ে যান"। কমেন্ট বক্সে আমাকেও খোঁচাখুঁচি শুরু করেছে একদল কূপমন্ডুক। যারা একটা সামান্য আলোচনা অনুষ্ঠান নিতে পারেন না তাদের প্রতি করুণা ছাড়া আর কিছুই দেবার নেই।

নাদিরা ইয়াসমিন আপু আপনি সঠিক পথেই আছেন। মেরুদণ্ড সোজা রেখে সামনে এগিয়ে যান।

...min and 93 others

Comment Share

নারী অঙ্গন
30 April 2024 ·

ইসলামের প্রেক্ষিতে সম্পত্তি বন্টনে নারী-পুরুষের সমান অধিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ আছে আমার। আপনারা সেই আলাপ হয়তো দেখে থাকবেন। এখানে একটা জরুরি নোকতা যুক্ত করি। অনেকেই প্রশ্ন করেন, সম্পত্তিতে নারীকে যতটুকু অধিকার দেয়া হয়েছে সেটা যখন তারা পায় না, সেখানে সমান অধিকার দাবি কতোটা বাস্তব। আদতে অধিকার সমান না থাকাটাই যে সম্পত্তি না পাওয়ার মূল কারন এটা তারা ধরতে পারে না।

ব্যাখ্যা করা যাক। পৈতৃক সম্পত্তিতে ভাইয়ের তুলনায় বোন যে অর্ধেক পায় এটা পারিবারিক ও সামাজিক বলয়ে নারীর অবস্থান, গুরুত্ব ও মর্যাদা অর্ধেকে নামিয়ে আনে। নারীর সম্পত্তির মালিক হওয়াকে তুচ্ছতায় পর্যবসিত করে। বিষয়টাকে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করে। ফলত, বোনদের সম্পত্তি দেয়া জরুরি মনে করে না বাঙালি মুসলমান ভাইয়েরা। আবার অনেক নারী পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার সিরিয়াসলি নেয় না। অনেকে কিছু টাকার বিনিময়ে বা এমনিতে না-দাবি দিয়ে ভাগ ছেড়ে দেয়। কিন্তু সম্পত্তিতে সমানাধিকার থাকলে বিষয়টা অন্যরকম হতো। তখন নারীর অবস্থান, গুরুত্ব ও মর্যাদা সমাজে পুরুষের সমানভাবে হাজির হতো। সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ... বেশ কঠিন হয়ে যেতো। এখন যার... লেখার লিঙ্ক ফলো করুন।

মোকাররম হোসেন

মমিন আক্রাদ and 81 o...

Like

নারী সংহতি সঞ্চালক
26 April 2024 ·

“পারিবারিক সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা”—নিয়ে শুধু আলোচনা করতে গিয়ে ‘নাস্তিকতার ট্যাগ’ খেয়ে হেনস্থার শিকার হয়েছেন Nadira Yeasmin নাদিরা ইয়াসমিন এবং তার সংগঠন ‘নারী অঙ্গন’। বিষয়টি শুধু নাদিরা ইয়াসমিনের জন্য নয়, এদেশের চলমান নারী অধিকার তৎপরতার জন্য ভীষণ উদ্বেগের।

অভিন্ন পারিবারিক আইনের দাবি এখানকার ডান, বাম রাজনৈতিক ঘরানা কিংবা এনজিও নারী অধিকার কর্মীদের সাধারণ দাবি। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সাথে দেখেছি, এ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো সরকারই জাতিসংঘের নারী অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women)-এর সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে হাত দেয়নি। বরং পুরুষতান্ত্রিক সরকার সমাজের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে হাতিয়ার করে সম্পত্তিতে সমানাধিকারের প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে বারবার।

২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিকে ঘিরে সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকারে প্রসঙ্গে (যদিও নীতিমালায় সম্পত্তিতে সমানাধিকারে বিষয়ে তেমন কিছুই ছিল না) বিভিন্ন ধর্মের নারী বিদ্বেষী শক্তি মাঠে নেমেছিল। সেই সময় এই নারী-বিদ্বেষী শক্তির বিপরীতে এখানকার নারী অধিকার কর্মীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের সামষ্টিক সাহসী শক্তি হিসেবে গড়ে উঠেছিল ‘সম অধিকার আমাদের ন্যূনতম দাবি’, যার অন্যতম সংগঠক হিসেবে নারী সংহতি সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিল।

এই দেশে নারী অধিকারের প্রশ্নে ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে মতবিরোধ নতুন কিছু নয়। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় অন্য জায়গায়। নাদিরা ইয়াসমিন প্রশ্ন করেছেন, একটা গণতান্ত্রিক দেশে মত প্রকাশের অধিকারতো সবারই থাকার কথা। আমাদেরও একই প্রশ্ন, একটি ‘গণতান্ত্রিক’ দেশে তাহলে কীভাবে এই নিরীহ আলোচনায় এত বিপত্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব হলো? এখানেই ধর্ম নিয়ে নোংরা রাজনীতির অনেক জরুরি প্রসঙ্গ সামনে চলে আসে।

কোনো বিষয়ে পরিবর্তন রাতারাতি হবে না। পরিবর্তন করতে হলে সকলের মতকেই আমলে নিতে হবে। এদেশের নারীরা তাদের অধিকারের প্রশ্নে সমাজের সকল গোষ্ঠীর সাথেই আলোচনা করতে প্রস্তুত । কিন্তু, এখানে যদি সচেতনভাবে নানাগোষ্ঠী ধর্মীয় ট্রাম্প কার্ড নিয়ে খেলে, তাহলে নারীর জন্য বিপদ, ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য বিপদ ।

নারী সংহতি নাদিরা ইয়াসমিনের ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণের ঘটনায় নিন্দা এবং একইসাথে ‘নারী অঙ্গনের’ কর্মসূচির সাথে সংহতি জ্ঞাপন করছে।

নারী অঙ্গন
29 April 2024 ·

স্ত্রীর হক থাকার কারণে ভাই দ্বিগুণ পেলে স্ত্রীর সম্পত্তিতে হাজব্যান্ডের হক থাকতো না। এই বিষয়টা বেমালুম চেপে যাওয়া হয় যে, স্বামীরাও স্ত্রীর সম্পত্তিতে ভাগ পায়। আর বোন সমান অংশ পেলে ভাইয়েরা বোনের প্রতি কিছু করবে না সত্য হলে, সমান অংশ পাওয়া দুই ভাইও একজন আরেকজনের প্রতি কিছু করতো না। কিন্তু তা হয় না। বিপদ আপদে ভাই যথাসাধ্য করার চেষ্টা করে আরেক ভাইয়ের প্রতি। সমান সম্পত্তি পেয়েছে বলে সরিয়ে দেয় না।

রইলো ভরণপোষণের কথা, ভাইয়েরা অ্যাডাল্ট বোনের প্রতি দায়িত্ব বলতে বোনের হাজব্যান্ড আর বাচ্চাদের মেহমানদারিত্বই বোঝে, সেটুকুই করে। বা সাথে সামাজিকভাবে আরো কোনো প্রথা টথা থাকলে সেটুকু করে। বোনের ভরনপোষণ ভাইয়েরা করে না। এখানেও বোনেদের দেখভালের জন্য তার ভাগে বেশি যাচ্ছে এই যুক্তি খাটছে না।

আর বোনের সংসার ভাঙলে যেভাবে বলা হয় সে আবার ভাইয়ের সংসারে ভাইয়ের ভরনপোষণে ফিরে এসেছে, সেটিও সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে বোন তার নিজের পিতৃগৃহে নিজের উত্তরাধিকারে ফিরে এসেছে যেটা তার হক। সেটা নষ্ট করে বোনকে দুমোঠো ভাত খাইয়ে ভাইয়েরা তার মিরাস মেরে দিয়ে মহান সাজার দাবী ধূর্ত প্রতারণা।

TaZkia TaNha

মমিন আহ্লাদ and 86 others — 26 comments 5 shares

Like Comment Share

Nadira Yeasmin
25 Ap...

নরসিংদী ... কার নিয়ে সাধারণ একটা
আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন ... থেকে।
তাতে শান্তির ছেলেদের পেছনে আগুন ধরে গেছে। তারা ... তা বটেই নাদিরা ইয়াসমিনরে
বয়কটের দাবী তুলছে কারণ তারা জীবনে বয়কট ছাড়া আর কিছু ... নাই।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই ঘটনার একমাত্র নিয়ামক শান্তির ছেলেরা না। নাদিরা ইয়াসমিন সাধারণ চেহারার দৃঢ়চেতা এক নারী। নরসিংদীর স্থানীয় নন তিনি, চাকরি করতে এসে কলেজ প্রশাসনের খোলনলচে পাল্টে দিয়েছেন। এখন এসব করতে গিয়ে কাদের স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে আপনারা বুঝে নেন। সরকার নারীর ক্ষমতায়ন করতে নানা কিছু করছে কিন্তু ক্ষমতায়িত নারী ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গেলে সরকারেরই নানান পোষ্যর খুব গায়ে লাগে।

একজন নারীরে ঠ্যাকাইতে তারে "নাস্তিক নারীবাদী" ট্যাগ দেয়ার যে কৌশল ইনারা নিছেন সেইটা উনাদের চরিত্রের অংশ। কিন্তু এই বিষয়টা আমরা যে দেখতেছি, আমরা যে এইসব কৌশল বুঝে গেছি, ধর্ম কার্ড খেইলা আপনারা যে সেই পুরানা অভ্যাস অনুযায়ী আগাইতাছেন তা আমরা বুঝতেছি- তা জানায় গেলাম।

আর হ্যাঁ, এইরকম নাদিরা ইয়াসমিনরা যতদিন আছেন আমাদের সমাজে ততদিন শান্তির ছেলেদের পশ্চাৎদেশে আগুন লাগতেই থাকবে। এই নাদিরা ইয়াসমিনরাই আমাদের সত্যিকারের বাতিঘর।

Nadira Yeasmin, তাহমিনা ববি and 154 others — 7 comments

Like Comment Share

Arif Sohel
25 April 2024 ·

নরসিংদীতে নারী অধিকার ... সমানাধিকার নিয়ে একটি
আলোচনা সভা আয়োজন ক... ...রআন অবমাননার অভিযোগ তুলে
এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে ... আপাকে ব্যক্তি আক্রমন করে
চলেছেন।

একটা প্রসঙ্গ খুব পরিষ্কার করা জরুরি ... ...রে বহুমাত্রিক মতামত মোকাবেলায় কি করতে হয়,
কি করা উচিত সে ব্যাপারে আমাদের ন... ...শেই যথেষ্ট উদাহরণ আছে, বিশেষ করে তাঁর মদীনা
জীবনে যখন তাঁকে প্রশাসকের দায়িত্ব পা... ...তে হয়েছে। যেকোন মতবিরোধকেই সংঘর্ষ ও মস্তানির
উপলক্ষ বানানো আইয়ামে জাহেলিয়ার বৈশিষ্ট্য যাকে অতিক্রম করে সামাজিক পরিসরে আলাপের বিপরীতে পাল্টা আলাপ, ডায়ালোগের মধ্য দিয়ে মতপার্থক্য নিরসনের ব্যাবস্থা রাসূল (সাঃ) তাঁর মদীনা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নাদিরা আপাদের আয়োজিত শান্তিপুর্ন আলাপের বিপরীতে মস্তানি, শক্তি প্রয়োগের হুমকি, জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ এইগুলো যারা করছেন তাঁরা জাহেলি যুগকেই অনুসরনীয় বানিয়েছেন। আবু জেহেল তাদের নেতা।

নিজ পরিবারের নারীদের কাছে সম্পত্তি হারানোর ভয় কিংবা অর্থনৈতিক লোভ লালসা এই মবকে চালিত করছে। মক্কায় বনু কুরাইশ যারা যাকাত অস্বীকার করেছিলো, দাস ও ইয়াতীমদের হক বুঝায়ে দিতে দাবি করায় মুসলিমদের ওপরে জুলুমের খড়গ নামিয়ে এনেছিলো তাদের সাথে এদের তো কোনো পার্থক্যই নাই সম্পত্তি যেকোনোভাবে কুক্ষীগত করে রাখাই যেখানে উদ্দেশ্য। ইন্নামাল আ'মালা বিন নিইয়্যাত! কর্মফল উদ্দেশ্যের ওপরে নির্ভরশীল। যাদের উদ্দেশ্য যেকোনো মূল্যে সম্পত্তি কুক্ষীগত করে রাখা তাদের কর্মফলও সে মতেই হবে। ইসলাম রক্ষা বা কুরআনের সাথে তাদের দাবির কোনো যোগসাজশ থাকতে পারে না।
নাদিরা আপার প্রতি ঘটে চলা সকল মস্তানির নিন্দাবাদ জানাই। তাকে মুক্তভাবে বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ দিতে হবে।

Nadira Yeasmin and 15 others — 1 comment

Like Comment Share

আজকের পত্রিকা

US-BANGLA AIRLINES FLY

নরসিংদীতে নারী অঙ্গনের সভা বাতিল, নারী অধিকারকর্মীদের ক্ষোভ

নরসিংদী প্রতিনিধি ও নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রকাশ : ২৭ এপ্রিল ২০২৪, ০০: ৪০ আপডেট : ২৭ এপ্রিল ২০২৪, ১৩: ৫৪

নারী অঙ্গন

হিস্যা

ফেব্রুয়ারি ২০২৫